লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

সম্বৎ ১৯৪৭

মূল্য ৸৹ বারো আনা।

PRINTED BY AKSHAYA KUMAR GHOSE,
AT THE "NEW SANSKRIT PRESS"
7, SHIBKRISTO DAWN'S LANE, JORASANKO,
AND
PUBLISHED BY THT "SANSKRIT PRESS DEPOSITORY."
148, BARANASI GHOSH'S STREET,
CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

নৈমিষারণ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে, ভ্রাতৃগণসহ তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত, বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, প্রকাশ্যমান পুস্তকের আখ্যানাংশ প্রধানতঃ আদি কবি মহামুনি বাল্মীকির অনুপম-লেখনী-প্রসূত “রামায়ণ” অবলম্বনে বিরচিত। অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে অনন্য-যোগ্য-স্পর্দ্ধা-পরিচিত, কবি-কেশরী ভবভূতির “উত্তররামচরিত” নামক সমুজ্জ্বল কাব্যরত্নের অসমা সুষমা আহরণেরও প্রয়াসী হইয়াছি; এমন কি, স্থানে স্থানে কোন কোন শ্লোক অনুবাদিত হইয়াছে বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

বসুন্ধরায় রাম-চরিত্র অতুলনীয় সামগ্রী। বিশেষতঃ সৌভ্রাত্রের এবংবিধ অলৌকিক উদাহরণ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এক দিকে সত্যের শাসন, অন্য দিকে ভ্রাতৃপ্রেমের প্রবল পরাক্রম, এই বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সজ্ঘর্ষণ মধ্যে, প্রাণান্ত পণ করিয়াও, ধর্ম্মের

অধীনতা স্বীকার করা, অবশ্যই মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। রাম-চরিতের এই অপার্থিব অংশ নিরতিশয় করুণ-রস-প্রধান ও বহুবিধ ভাবের লীলাস্থল। এতাদৃশ অসদৃশ ভাব নিচয় মাদৃশ জনের সামান্য লেখনী সুসম্বদ্ধ করিতে সক্ষমা হইয়াছে বলিয়া, আমার বিশ্বাস নাই। তথাপি যদি এতদ্দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গকে কিঞ্চিদপি বিনোদিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমি, আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া, চরিতার্থ হইব।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

বিহিত-বিধানে অধীত-বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত,

বহুশাস্ত্রাধ্যাপন-পরায়ণ,

অবিরত-বেদপ্রচারোপকৃত-বঙ্গীয়ার্য্যগণ,

শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী

মহাশয়ের পবিত্র নামে,

বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে,

তদীয় গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ সমাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনিবার্য্য লোকাপবাদ-ভয়ে, মাধুর্য্যময়ী মৈথিলী-সুন্দরীকে অরণ্য-বাসে প্রেরণ করিয়া, প্রজানুরক্ত রামচন্দ্র, নিরতিশয় নির্ব্বিঘ্ন ভাবে, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুযোগ্য সচিব-গণ এবং প্রাণোপম অনুজগণ, তাঁহাকে, ক্রমশঃ, সুকৌশলে, তদীয় কর্ত্তব্য-পথে আকৃষ্ট-চিত্ত করিলে, তিনি, অনতিকাল মধ্যে, বাহ্য শোকোচ্ছ্বাস প্রচ্ছন্ন করিয়া, রাজ-ধর্ম্ম-পালনে নিবিষ্ট-চিত্ত হই-লেন। দারুণ দুঃখের দাব-দাহে তাঁহার হৃদয়-কানন নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকিলেও, প্রজা-পালন-রূপ প্রবল কর্ত্তব্য, তাঁহাকে পুনরায় বিষয়-ব্যাপারের আলোচনায় বিনিবিষ্ট করিল এবং তিনি, স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ অসাধারণ বৎসলতা সহকারে, সর্ব্বপ্রকারে, প্রকৃতি-পুঞ্জের অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। সহ-ধর্ম্মিণীর সঙ্গ-শূন্য হইয়া ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব; অথচ পত্নী-প্রেমা-নুরক্ত, ধর্ম্ম-ভীত বৈদেহী-বল্লভ, সীতা ব্যতীত, অন্য কোন রমণীকে, পত্নীরূপে, পরিগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত; সুতরাং, জানকীর অনুকল্পে, তাঁহার কানকী মূর্ত্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠান-কালে, রঘুনাথের বামে বিরাজ করিতে লাগিল।

রামচন্দ্রের সুশাসন-প্রভাবে, সুবিস্তৃত কোশল-রাজ্য শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিল এবং প্রজাবর্গ, সর্ব্বতোভাবে নিরুপদ্রব

ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া, সুখ-সলিলে সন্তরণ দিতে লাগিল। রাম-রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম ও সুনীতি সঞ্চরিত হওয়ায়, জগতে তাহা অতুলনীয় হইয়া উঠিল এবং রাজ্যস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সত্য ও ন্যায়-পরায়ণ রঘুনাথের পবিত্র নাম, পরম পুলকিতান্তঃকরণে, ভক্তি-চন্দন-সম্পৃক্ত প্রীতি-কুসুম-সহকারে, সম্পূজিত করিতে থাকিল। গৃহে গৃহে তাঁহার অপার্থিব গুণ-গ্রাম সংঘোষিত এবং তদীয় মহামহিমময় কীর্ত্তি-কলাপ অনুকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে, সুদক্ষতা সহকারে, প্রকৃতি-পুঞ্জকে উন্নতি-শৈল-শিখরে সমাসীন করিয়া, গুণময় রামচন্দ্র রাজোচিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলেন এবং মন্ত্রণা-কুশল অনুজগণের সহিত তদ্বিষয়ক পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরত তৎকালে রাজধানীতেই ছিলেন; কিন্তু শত্রুঘ্ন তখন, রামচন্দ্রের আদেশানুসারে, নব-বিজিত মধুরা প্রদেশে, রাজ্য-স্থাপন করিয়া, রাজ-কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। একদা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও ভরতকে সন্নিধানে সমাহূত করিয়া, তাঁহাদের সকাশে, স্বকীয় বাসনা পরিব্যক্ত করিলেন। ভ্রাতৃ-যুগল জ্যেষ্ঠের সংকল্প শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা, রামচন্দ্র অক্ষয় কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন।

তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, "ভ্রাতঃ! বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ অশ্বমেধ-নিপুণ এই সুবিজ্ঞ ও পূজ্য-পাদ বিপ্র-চতুষ্টয়কে আমন্ত্রিত করিয়া, রাজধানীতে আনয়ন কর এবং, তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্য সমস্ত সুস্থির কর; আর, মধুরা পুরী হইতে শত্রুঘ্নকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, অবিলম্বে দূত প্রেরণ কর।"

অনতি-কাল-মধ্যে, সুদক্ষ লক্ষ্মণ উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণকে, সমাদর সহকারে, রাজ-সভায়, উপস্থাপিত করিলেন। রামচন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহাদের যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া, বিনয়-নম্র-ভাবে, আপনার মনোগত অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তাঁহারা, সীতা-পতির এই সাধু সংকল্প শ্রবণ করিয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং অশ্বমেধ-রূপ মহাযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা ও গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান-বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি ও তৎসংক্রান্ত উপদেশাদি প্রদান করিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"বৎস! গোমতী-তীরে, পবিত্র নৈমিষ্যারণ্য ক্ষেত্রে, এই মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয়; অতএব তুমি সেই স্থানে সুবিস্তৃত যজ্ঞ-ক্ষেত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দেও। আর আমার পরম মিত্র মহাত্মা সুগ্রীবকে এবং বিপুল-বল-শালী ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণকে, সৈন্যাদি সহ সমাগত হইয়া, এই মহাযজ্ঞোৎসবে যোগ-দান করিতে আমন্ত্রণ কর। যে সকল ভূপতি মদীয় সমুন্নতি সন্দর্শনে প্রীতি-লাভ করেন তাঁহাদিগকে, সানুচর সমাগত হইবার নিমিত্ত, সমাদরে আহ্বান কর। এই উপলক্ষে, নানা-দিগ্দেশ-বাসী, ধর্ম্ম-পরায়ণ, ব্রাহ্মণগণকে, ভক্তি সহকারে, নিমন্ত্রিত কর। পুণ্যমূর্ত্তি, মহাভাগ মহর্ষিগণকে, সস্ত্রীক সমাগত হইবার নিমিত্ত, বিনয় ও ভক্তি সহকারে, আমন্ত্রণ কর। রঙ্গ-নিপুণ সূত্রধার এবং তালাবচর নটাদি আমোদ-কুশল জনগণের, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবার, ব্যবস্থা করিয়া দেও। সহস্র সহস্র বলীবর্দ্দ সাহায্যে, আহার্য্য সামগ্রী যজ্ঞ-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে আরম্ভ কর।"

তদনন্তর রঘুনাথ ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয় বৎস! তুমি সর্ব্বাগ্রে, বিপুল স্বর্ণ ও রজত-মুদ্রা লইয়া,

নৈমিষারণ্যে গমন কর। তোমার অগ্রে অগ্রে বহু-সংখ্যক সৈন্য যাত্রা করুক। নানাবিধ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি তোমার অনুগামী হউক। আর পূজনীয়া মাতৃদেবীরা ও অন্যান্য পৌর-নারীগণ তোমার সঙ্গে গমন করুন।" পৌর-নারীগণের প্রসঙ্গ সমুত্থাপিত হওয়ায়, চিরজাগরূক সীতার বিরহ-বেদনা রামচন্দ্রকে নিতান্ত ব্যথিত ও বিকলিত করিল এবং তাঁহার যত্নরক্ষিত ধৈর্য্য-বাধা অতিক্রম করিয়া ও সাবধানতার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, নয়ন-প্রান্ত হইতে অজস্র-ধারে, অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামময় রামানুজ-দ্বয়, জ্যেষ্ঠের হৃদয়-ভাব অনুধাবন করিয়া, সজল-নয়নে ও অধোবদনে, তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায়, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনতি-কাল-মধ্যেই, সবল-হৃদয় রামচন্দ্র, এই নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, ভরতকে পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"আর ভ্রাতঃ! তুমি মদীয় যজ্ঞ-দীক্ষার নিমিত্ত, সযত্নে, মৈথিলীর হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া যাও। সীতার অবর্ত্তমানে, তদীয় প্রতিমাই হতভাগ্য রামের একমাত্র অবলম্বন। তুমি, যজ্ঞ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, নিমন্ত্রিত ঋষি, তপস্বী, ভূপাল ও বান্ধবগণের বাসোপযোগী, পট-মণ্ডপাদি বিনির্ম্মাণে বিনিযুক্ত হও।"

তদনন্তর রামচন্দ্র, অচিরাগত শত্রুঘ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন,—"বৎস! তুমি ভরতের সঙ্গী হও এবং সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহার সাহায্য করিতে নিযুক্ত থাক।"

রামানুজগণ, রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া, আদেশানুরূপ কর্ত্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আয়োজনের ভূরি-ভাগ সম্পন্ন হইলে, রামচন্দ্র সৈন্যাদি

পরিবৃত হইয়া, হৃষ্ট মনে, যজ্ঞ সাধনার্থ, নৈমিষারণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায়, অনুজ-ত্রয়-কৃত, যজ্ঞ-ক্ষেত্রের শোভা ও সুশৃঙ্খলা সন্দর্শনে রামচন্দ্র যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন। দেখিলেন, মধ্য-স্থলে সুবিশাল চন্দ্রাতপ সমাচ্ছন্ন যজ্ঞশালা এবং চতুষ্পার্শ্বে, সমাগত নিমন্ত্রিতগণের বাস-জন্য, অগণ্য কেতন-পরিশোভিত সুরম্য মণ্ডপ-সমূহ শোভা পাইতেছে। নানা-দিগ্দেশীয় নরপতি, তাঁহাদের অনুচর ও সৈন্য-মণ্ডলী, তেজঃপুঞ্জ ঋষি-তপস্বী, অসংখ্য জ্যোতিষ্মান্ ব্রাহ্মণ, অগণ্য অতিথি ও অভ্যাগত, বহুসংখ্যক যাচক ও প্রার্থী প্রভৃতির সমাগমে নৈমিষারণ্য তৎকালে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুগ্রীব, বিভীষণাদি রাম-সুহৃদ্গণ, আবশ্যকাধিক অনুচর-সহ, ভরত-শত্রুঘ্নের নিদেশানুসারে, সমাগতগণের পরিচর্য্যায় বিনিযুক্ত। সর্ব্বত্র সুরস খাদ্য ও সুমিষ্ট পানীয়ের বিপুলায়োজন। স্থানে স্থানে নর্ত্তন-নিপুণা নর্ত্তকীগণ, নৃত্য-সহকারে, নিমন্ত্রিতগণের চিত্ত-বিনোদনে নিযুক্তা। কোথায়ও বা, সুদক্ষ নট, অভিনয়-বিশেষের অবতারণা করিয়া, দর্শক-বৃন্দের প্রসাদনে প্রয়াসী। কোথায়ও বা, সুকণ্ঠ গায়ক, তান-লয়-সহকৃত সংগীতালাপ দ্বারা, শ্রোতৃগণের মনোমোহনে মত্ত। ফলতঃ, সেই সুবিশাল যজ্ঞ-ক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই আনন্দ, যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, বিরাজ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যজ্ঞ-ক্ষেত্রে, রামচন্দ্রের শুভাগমন হইলে, দেশান্তরাগত ভূপালবর্গ, নানাবিধ উপহার প্রদান করিয়া, তাঁহার সর্ব্বভৌমিকত্ব স্বীকার ও মনস্তুষ্টি-সম্বিধান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বিহিত-বিধানে, বৎসর-ব্যাপী এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। যাচকেরা যাবৎ পূর্ণকাম না হইল, তাবৎ

তাহাদিগকে, প্রার্থনানুরূপ, অন্ন-বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি প্রদত্ত হইতে লাগিল। ভিক্ষুকের, বদন হইতে, প্রার্থনা-বাক্য বিনির্গত হইতে না হইতেই, রামানুচরগণ তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে আরম্ভ করিল। প্রচুর-পরিমাণ ভোজ্য-সম্ভোগ করিয়া, সমাগত জীব-গণ হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠিল। সুদীর্ঘ-জীবী মুনিগণ মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা, অন্যান্য নৃপালকৃত, অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এবম্বিধ অত্যদ্ভুত দান-ব্যাপার কুত্রাপি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কর্ম্ম-চারিগণের শৈথিল্য-হেতু, বা আয়োজনের অপূর্ণতা হেতু, এই সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী দান-কাণ্ডে একদিনও অনুমাত্র বৈলক্ষণ্য বা অঙ্গ-হীনতা সঙ্ঘটিত হয় নাই।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের আদেশানুসারে, লক্ষ্মণ, নিরপরাধা, পূর্ণগর্ভা জনক-নন্দিনীকে, অরণ্য-মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিলে, জানকী, নিজাদৃষ্টকে অগণ্য ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে, ভূ-লুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে, সন্নিহিত তপোবন-বাসী, মহর্ষি বাল্মীকি সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া, সেই পতি-বিয়োগ-বিধুরা, মর্ম্মাহতা সীতা-সুন্দরীকে, পরমাদরে, স্বকীয় আশ্রম-প্রদেশে আনয়ন করিলেন এবং তদবধি, অপত্যাধিক যত্নে, তাঁহাকে লালন-পালন ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাকালে সীতা দুই সুকুমার-কায় যমজ-কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি তাহাদের কুশ ও লব এই নাম রক্ষা করিলেন। রাম-কুমার-দ্বয়ের আকৃতি অবিকল পিতার অনুরূপ হইল। তাহাদের জননী সীতাদেবী যে রামচন্দ্রের সহ-ধর্ম্মিণী এবং তাহারা যে রাজাধিরাজ রামচন্দ্রেরই তনয়, এ সকল সংবাদ তাহাদের নিকট হইতে, সযত্নে, সংগোপিত থাকিল।

মহর্ষি বাল্মীকি এই শিশু-দ্বয়কে, যথা-বিহিত যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে থাকিলেন এবং শস্ত্র-বিদ্যায় ও শাস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তপোধন, ইতিপূর্ব্বেই অপূর্ব্ব রাম-চরিত অবলম্বনে, নানাবিধ মনোজ্ঞ ছন্দোবন্ধময় রামায়ণ নামে এক সুমধুর মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সীতার কুমার-দ্বয়, অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, মহর্ষির যত্নে, সেই

সুবৃহৎ রামায়ণ-কাব্যান্তর্গত রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-সূচনা পর্য্যন্ত তাবৎ অংশ শিক্ষা করিল এবং, তান-লয়-সংযোগে, তাহা কোমল কণ্ঠে গান করিতেও অভ্যাস করিল।

রামানুষ্ঠিত এই মহাযজ্ঞোপলক্ষে মহর্ষি বাল্মীকিও, সশিষ্য উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি, প্রিয়-শিষ্য কুশীলবকে সঙ্গে লইয়া, যজ্ঞ-স্থলে সমাগত হইলেন এবং ঋষিগণের মণ্ডপাংশে নির্দ্ধারিত স্থানে, অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজ-দূতেরা বিবিধ বিধানে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। মহর্ষি একদা কুশীলবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তোমাদিগকে বহু যত্নে যে রামায়ণ গান করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, তোমরা তাহাতে কীদৃশ পারদর্শী হইয়াছ, অধুনা তাহার পরীক্ষা-প্রদানের প্রকৃষ্ট অবসর সমুপস্থিত হইয়াছে। এই মহাযজ্ঞ-স্থলে বহুতর নরপতি এবং বহুতর ঋষি ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন। অধিকন্তু, যে প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাত্মার পুণ্যময়-পবিত্র-চরিত্রাবলম্বনে এই মহাকাব্য গ্রথিত হইয়াছে, তিনিও, স্বজনগণ-সহ, এ ক্ষেত্রে উপস্থিত। অতএব, তোমরা এই মহাযজ্ঞ-স্থলের প্রকাশ্য স্থান-বিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া, উৎসাহ সহকারে, শ্রোতৃগণ-সমক্ষে, প্রতিদিন আমূল রামায়ণ ক্রমশঃ গান করিতে আরম্ভ কর। যদি কদাপি মহারাজ রামচন্দ্র, তোমাদিগের এই গান শ্রবণের নিমিত্ত, ঔৎসুক্য সহকারে, তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপ-গত হইয়া, আদিকাণ্ড হইতে গানারম্ভ করিবে এবং তাঁহাকে বিনোদিত করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হইবে। যদি রামচন্দ্র তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসু হ'ন, তাহা হইলে বলিবে যে, তোমরা বাল্মীকির শিষ্য।

কাহারও নিকট হইতে, পুরস্কার-স্বরূপে কিঞ্চিন্মাত্রও অর্থাদি গ্রহণ করিবে না। যাহারা আশ্রম-বাসী ও কন্দ-মূল-ফলাশী, ধনে তাহাদের কোনই প্রয়োজন নাই। এখন যাও বৎস! তোমাদের এই মোহন বীণা-যন্ত্র করে লইয়া, ষড়জাদি স্বরোদ্ভাবন পুরঃসর, মূর্চ্ছনা সহকারে, মধুর রামায়ণ গান করিয়া, সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হও।”

কুশীলব, ভক্তি-ভাবে গুরু-চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞাপালনে উদ্যুক্ত হইল এবং পরদিন, স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, প্রকাশ্য-স্থান-বিশেষে, গানারম্ভ করিল। ক্রমশঃ, তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি মহারাজ রামচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তিনি সমীপাগত হইয়া, এই শিশুদ্বয়ের কোমল কণ্ঠে, আত্মচরিতের অবিকল ও অপূর্ব্ব বিন্যাস শুনিয়া, নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং, সভা-স্থলে সঙ্গীত করিবার জন্য, তাহাদিগকে আগ্রহ সহকারে, অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, বালকদ্বয় সন্তোষ সহকারে রাজ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। নির্দ্ধারিত সময়ে, এই কল-কণ্ঠ বালকদ্বয়ের সুসম্বদ্ধ, স্বর-সংযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণার্থ, মহারাজ রামচন্দ্র সমাগত রাজগণ, ঋষিগণ, পণ্ডিতগণ, পৌরগণ ও অন্যান্য তাবৎকে আহ্বান করিলেন। সঙ্গীত শ্রবণার্থিগণের সমাগমে সভা-কুট্টিম পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং, ঐ সুকুমার শিশু-দ্বয়ের অতি মধুর গীত শ্রবণার্থ, সকলে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এই দুই সুঘটিত-কলেবর বালক দর্শনে রামের হৃদয়ে, অজ্ঞাতসারে, এক অননুভূত-পূর্ব্ব বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই বালকদ্বয়ের সহিত সম্পূর্ণ আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল এবং, তাহাদিগকে অঙ্কে

ধারণ করিবার নিমিত্ত, স্নেহাবেশে, তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, যদি তিনি অমূলক লোকাপবাদ-ভয়ে পূর্ণগর্ভা জানকীকে নির্ব্বাসিতা না করিতেন, তাহা হইলে, তিনি অনতিকাল মধ্যে যে সুকুমার শিশু প্রসব করিতেন, সেই নন্দন, এতদিনে অবিকল দৃশ্যমান শিশু-দ্বয়ের সমবয়স্ক হইয়া, এইরূপ লোক-লোচনানন্দ-দায়ক কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট হইত। কিন্তু হায়! কাণ্ড-জ্ঞান-হীন হতভাগ্য রামের অদৃষ্টে সে সুখ-সৌভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? জন-হীন ঘনারণ্যে, নিশ্চয়ই জনক-নন্দিনীর জীবন বিগত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার গর্ভজাত সন্তানের প্রসঙ্গ কল্পনা করা, সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। এইরূপ মনে করিয়া এবং পতনোন্মুখ নয়ন-নীর, অতি কষ্টে, নিবারণ করিয়া, রামচন্দ্র উক্ত বালকদ্বয়কে সঙ্গীতালাপে অনুমতি প্রদান করিলেন।

তখন মুনি-বালকদ্বয়, বীণা-যন্ত্র-সহকৃত, অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনিতে সেই মহতী সভা সম্পূরিতা করিয়া তুলিল এবং শ্রোতৃ-বৃন্দকে অলৌকিক আনন্দে, অভিভূত করিয়া দিল। সমবেত সভ্য-মণ্ডলী বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে, এই গুণবান বালকদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিলেন যে, এই দুই অপরূপ বালক যেন অবিকল মহারাজ রামচন্দ্রেরই প্রতিরূপ। যদি ইহাঁরা তাপস-তনয়-বেশ-ধর না হইতেন, তাহা হইলে, বয়োগত বিভিন্নতা ব্যতীত, ইহাঁদিগের আকৃতিগত অন্য কোন বিভিন্নতাই পরিলক্ষিত হইত না।

কুশীলব ক্লান্ত হইলে, সাধারণের অনুরোধে, সে দিন সঙ্গীত ক্ষান্ত হইল। মহারাজ রামচন্দ্র, প্রচুর-পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়া, এই দুই বালককে পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত, ভ্রাতৃ-

গণকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অর্থ আনীত হইল; কিন্তু কুশীলব, তাহা স্পর্শ না করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে, নিবেদন করিল,—"মহারাজ! আমরা বনবাসী, ফল-মূল-ভোজী এবং অর্থ-লভ্য-ভোগ-স্পৃহা-বিবর্জ্জিত। অতএব অর্থে আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। আপনার ন্যায় পুণ্যময় প্রাতঃ-স্মরণীয় ব্যক্তির দর্শন-লাভ করিয়া, আমরা যেরূপ চরিতার্থ হইয়াছি, অন্য পুরস্কার তাহার সমতুল্য নহে।"

বালকদ্বয়ের এতাদৃশী অলুব্ধতা ও বিনয়শীলতা দর্শনে সভাস্থ তাবতেই বিমোহিত হইলেন এবং মনে মনে, তাহাদের গুণ-গ্রামের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র, বালকদ্বয়কে সন্নিকটে সমানীত করিয়া, প্রীতি-বিকসিতাননে ও স্নেহ-গদ্গদ-স্বরে, এই রামায়ণ-রূপ মহাকাব্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে কুশীলব সবিনয়ে নিবেদন করিল,—"মহাভাগ! বিশুদ্ধ-চেতা, মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান-স্বরূপ মহর্ষি বাল্মীকি এই মহাকাব্যের রচয়িতা। ইহা বহু জ্ঞানোপদেশ ও তত্ত্বোপদেশ সমন্বিত বহ্বায়ত গ্রন্থ। ভবদীয় অতুলনীয় কীর্ত্তি-কলাপ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই মহাকাব্য সপ্ত-কাণ্ডাত্মক ও নানাবিধ মনোজ্ঞ ছন্দে সুসম্বদ্ধ। আমরা, মহর্ষির কৃপায়, বাক্য-স্ফূর্ত্তি-কাল হইতে, এই কাব্য অভ্যাস করিয়াছি। হে রঘু-কুল-পুঙ্গব! যদি আপনি এই মহাকাব্য সমগ্র শ্রবণে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে যজ্ঞ-প্রয়োগাবসরে, ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণ সহ, নিয়মিতরূপে শ্রবণ করিবার ব্যবস্থা করুন। আমরা, তদুপলক্ষে, ভবৎ-সমীপে, এই শিক্ষিত বিষয়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়া, কৃতার্থ হই।"

মহারাজ রামচন্দ্র, বালকদ্বয়ের বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া,

নিয়মিতরূপে, সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত, রামায়ণ গান শ্রবণার্থ, সময় স্থির করিলেন। তদনন্তর, তদীয় চরিতাবলম্বনে এই সুবিশাল কাব্য রচনা করায়, মহর্ষি বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ; স্নেহ-জনক সুদর্শন ও পরম গুণবান তচ্ছিষ্য কুশীলবের গুণানুকীর্ত্তন ইত্যাদি মানসে, রঘুনাথ, মুনি-বালকদ্বয়ের সহিত, মহর্ষির তদানীন্তন বাস-ভবনে গমন করিলেন। তথায় রামচন্দ্র, বহুক্ষণ মহর্ষির সহিত নানাবিধ বাক্যালাপ করিয়া, ক্রমশঃ এই দেব-কান্তি-সম্পন্ন শিশু-দ্বয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন এবং তাহাদের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি, শিশুদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, এই মাত্র জ্ঞাপন করিলেন যে, তাহারা তাঁহার আশ্রম-নিবাসিনী জনৈক দুঃখিনীর সন্তান। কুশীলবের সমধিক পরিচয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রামচন্দ্র, নিতান্ত বিষণ্ণ মনে, মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রত্যাগত হইয়া, বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্র বিষম সন্দেহ-তিমিরাবৃত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহার আদেশক্রমে লক্ষ্মণ সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন-সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তৎকালে জনক-তনয়া পূর্ণগর্ভা। তাঁহার তদানীন্তন দারুণ দুরবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া, করুণা-প্রবণ মহর্ষি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রম-পদে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এ অনুমান নিতান্ত অসম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ, এই বালকদ্বয় সীতার গর্ভজাত যমজ কুমার। ইহাদিগের বর্ত্তমান বয়স বিবেচনা করিলেও, এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। রামের সহিত

তাহাদের আকৃতির সম্পূর্ণ সাম্য এইরূপ সন্দেহের সবিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আবার রামের মনে হইতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভব? সেই গর্ভ-ভার-প্রপীড়িতা, কুসুম-সুকুমারী, কোমলাঙ্গী, সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল ও বিপদ-বহুল ঘোরারণ্যে পরিত্যক্তা হইয়া কিয়ৎকালও প্রাণ-ধারণে সক্ষম হইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং সীতার সন্তান সন্দর্শনের আশা নিরতিশয় বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ ভিন্নাভিমুখী ভাব-চক্রের সংঘর্ষণে রামের হৃদয় নিতান্ত আলোড়িত হইতে থাকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে কুশীলব, রাজ-সভায়, রামচন্দ্রাদির সমক্ষে, নিয়মিতরূপে রামায়ণ গান করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে ও তাহাদিগের মধুর বচন-বিন্যাস শুনিতে শুনিতে, তাহাদিগের প্রতি রামচন্দ্রের বাৎসল্যভাব উত্তরোত্তর, সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকিল, এবং তাহারা অবশ্যই আত্মজন বলিয়া বিষম বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। লক্ষ্মণাদি রামানুজগণ এবং কৌশল্যাদি পুরন্ধ্রীগণও, রামের ন্যায়, পুনঃপুনঃ এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন এবং এই শিশুদ্বয় সীতারই সন্তান বলিয়া, ক্রমশঃ, সকলের ধারণা জন্মিল।

মাতৃগণের পরামর্শে, একদা লক্ষ্মণ, কুশীলবকে অন্তরালে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগের সহিত নানাবিধ প্রিয়ালাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত, নানাবিধ সুকৌশলময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বালকদ্বয় আপনাদের পিতৃ-নাম বা তৎ-সংক্রান্ত কোন পরিচয়ই জ্ঞাত ছিল না; সুতরাং তদ্বিষয়ক কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহারা ইহজীবনে কেবলমাত্র করুণাময়ী ও শান্তি-স্বরূপা জননীকে জানিত। সুতরাং কিছু কিছু মাতৃবৃত্তান্ত বলিতে সক্ষম হইল। তাহারা বলিল, তাহাদের জননী নিতান্ত ধর্ম্মশীলা, কিন্তু তিনি নিরন্তর নিদারুণ বিষাদ-ভারে নিপীড়িতা এবং জীবন্মৃতাবৎ অবস্থাপন্না। অশ্রু-জলে তাঁহার নেত্র-যুগল প্রতিনিয়ত ভাসমান এবং গভীর শোক-বিজ্ঞাপক

সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার জীবত্ব-পরিচায়ক। তিনি যে সধবা তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই; কারণ তিনি নিয়তই তৎসূচক লক্ষণাদি রক্ষণে সবিশেষ যত্নশীলা। দুঃখিনী ভিন্ন, জননীর নামান্তর কদাপি বালকদ্বয়ের কর্ণগোচর হয় নাই।

বালক-মুখে ইত্যাকার বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতীতি জন্মিল যে তাহাদের দুঃখিনী জননী, আর্য্যা জনকনন্দিনী ভিন্ন, অন্য কেহই নহেন। তখন তিনি গলদশ্রু-লোচনে, বালকদ্বয়কে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"হা বৎস কুশীলব! তোমরা এই রঘুকুলেরই বংশধর। তোমরা আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব; কিন্তু দারুণ দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ তোমরা অধুনা জটা-বল্কল-যুক্ত ও সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত।" এই বলিতে বলিতে, বালকদ্বয়কে উভয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্মণ অন্তঃপুরিকাগণের সমীপাগত হইলেন এবং সমস্ত কথা তাঁহাদিগের গোচর করিলেন।

তখন কৌশল্যা দেবী, "হা বৎসে জানকি! হা রঘু-কুল-কমলিনি! এখনও তোমার জীবন অপগত হয় নাই?" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সপত্নীগণ, শুশ্রূষার দ্বারা, তাঁহার চেতনা-সংবিধান করিলে, তিনি, কুশ ও লবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া হৃদয়-ভেদী পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বালকদ্বয় এ সকল ব্যাপারের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে অক্ষম হইয়া, বিস্ময় সহকারে, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

এদিকে রোরুদ্যমান সুমিত্রা-নন্দন, সভামধ্যে, রাম-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। লক্ষ্মণের

বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র, "হা মিত-বাদিনি! হা চির-সুখ-সেবিতে! হা জন্ম-গ্রহণ-পবিত্রীকৃত-বসুন্ধরে! হা মহাবন-বাস-প্রিয়-সহচরি! এখন তুমি কোথায়?" বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সম-শোক-সন্তপ্ত অনুজ-ত্রয় বিহিত বিধানে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে সচেষ্টিত হইলেন। সভাস্থ তাবল্লোক এই সকল ব্যাপার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া কেহ বা হর্ষ, কেহ বা দুঃখ, কেহ বা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অচির-কাল-মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, রামচন্দ্র, সম্পূর্ণ-রূপে সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে, মহর্ষি বাল্মীকিকে সেই সভা-মণ্ডপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, ভরতকে প্রেরণ করিলেন এবং অন্তঃপুর হইতে, কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন। কুমারদ্বয় সমাগত হইলে, বাৎসল্য-বিকম্পিত-কলেবরে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং অসামান্য শোকাবেগ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"হা প্রিয়ে জানকি! হা রামময়-জীবিতে! হা মধুর-ভাষিণি! এখনও দুর্বৃত্ত, নৃশংস রাম তোমাকে প্রিয়-সম্ভাষণে সঙ্কুচিত হইতেছে না। এখনও বজ্র-হৃদয় রামের প্রাণ-বায়ু দেহাশ্রয় পরিত্যাগ করে নাই। তোমার নিদারুণ বিরহ-বেদনা সহ্য করিয়াও পাষাণ রাম অদ্যাপি জীবিত আছে। আইস প্রিয়ে! আইস মুগ্ধে! আইস সরলে! দেখিয়া যাও, তোমার সেই বিশ্বাস-ঘাতক, দুরাচার রাম,—যে রামকে প্রগাঢ় প্রণয়-বশে, তুমি কদাপি আপনা হইতে ভিন্ন বোধ করিতে না; সর্ব্বাপদ-বিনাশক বোধে নিদ্রা-কালে যে রাম-

হৃদয়ে তুমি, মস্তক স্থাপন করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে, নিদ্রিত হইতে; যে রাম তোমাকে গর্ভ-ভার-মন্থরা দেখিয়াও, দুরন্ত ব্যাধ যেমন গৃহ-পালিতা পক্ষিণীকে বধ করে; তদ্রূপে তোমাকে কাল-গ্রাসে নিপাতিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল;— দেখিয়া যাও শুভে! সেই পাতকী, অস্পৃশ্য, চণ্ডালাপেক্ষাও ঘৃণার্হ রাম অদ্যাপি স্বচ্ছন্দ-শরীরে জীবন-ধারণ করিয়া আছে!"

তদনন্তর রামচন্দ্র, সস্নেহে, বারংবার ক্রোড়স্থ শিশুদ্বয়ের বদন-চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হা বৎস কুশীলব! তোমরা রাজ-পুত্র হইয়াও, পিশাচ পিতার অত্যাচারে আজন্ম দুঃখী; মুনি-ব্রতাবলম্ব ক্লেশ-পালিত ও তোমরা ভুবন-বিখ্যাত সূর্য্য-বংশাবতংস হইয়াও, অপরিজ্ঞাত ও বন-বাসী। পিতা সত্ত্বেও, তোমরা পিতৃ-হীন ও মাতৃ-পালিত। বৎস! এই পাষণ্ড রামই তোমাদের এই সমস্ত অনিষ্টের এক-মাত্র কারণ।"

রামচন্দ্র যখন কুশীলবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এইরূপে আক্ষেপ করিতেছেন, তখন ভরতের সঙ্গে, তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি বাল্মীকি তথায় সমাগত হইলেন। কুশীলবের রামাঙ্কে অব-স্থান এবং রাম-লক্ষ্মণাদির অশ্রু-সমাকুল ম্রিয়মাণ ভাব দর্শন ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি ইতিপূর্ব্বজাত সমস্ত ঘটনাই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র, রামচন্দ্র, কুশী-লবকে ক্রোড় হইতে অবতারিত করিয়া, ব্যস্ততা সহ অগ্র-সর হইলেন এবং, মহর্ষির চরণ-তলে নিপতিত হইয়া, কহি-লেন,—"ভগবন্! আপনার নিকট অধম রাম চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ। আপনি কৃপা-সহকারে, অভাগী জানকীকে আশ্রয়-দান ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া, এ দাসানুদাসকে

চির-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। জন্মজন্মান্তরেও রাম এ ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে না। বলুন আপনি, আমার সেই চিরদুঃখিনী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? বলুন ভগবন্! আমার সেই সুখ-সেবিতা সীতা এক্ষণে কেমন আছেন?"

তখন মহর্ষি বাল্মীকি, পরম সমাদরে রামচন্দ্রকে চরণ-তল হইতে উত্তোলন করিয়া, উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! তোমার জানকী, নির্ব্বাসনের পর হইতে, আমার আশ্রমেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই দুই যমজ কুমার তাঁহারই গর্ভ-জাত। শোক-তাপে জানকী-লতিকা ম্লান ও বিশুষ্কাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। অধিক আর কি বলিব?"

এতক্ষণ, যদিবা, কাহারও হৃদয়ের প্রান্তভাগে সন্দেহের রেখা-মাত্রও লুক্কায়িত ছিল, অধুনা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে তাহা নিঃশেষে তিরোহিত হইয়া গেল। তখন সকলেরই ধ্রুবজ্ঞান হইল যে, নির্ব্বাসিতা সীতা অদ্যাপি জীবিতা আছেন এবং এই দুই নন্দন তাঁহারই গর্ভ-জাত। তখন পৌরকামিনীরা সন্তোষ-সম্মিশ্রিত শোক-প্রভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন। চারিদিকে হায় হায় শব্দ উঠিল! সকলেরই বদনমণ্ডলে বিপুল-বিষাদ-বিমিশ্রিত হর্ষ-জ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হইল।

তখন রামচন্দ্র, মহর্ষি বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া, কহিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! সীতার বিরহ-বেদনা আর ক্ষণমাত্রও সহ্য করা অসম্ভব। জানকীর জীব-লীলা সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ কথঞ্চিৎ প্রকারে তদীয় বিরহ-জনিত, নিদারুণ সন্তাপ সহ্য করিয়া, ভারভূত জীবন বহন করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অতঃপর মৈথিলী মৃত্যু-কবলিত হন নাই জানিয়া এবং তদীয় গর্ভ-জাত এই [illegible] নয়ন-বিনোদন

নন্দন-দ্বয় সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার অদর্শন-ক্লেশ এক মুহূর্ত্তও সহ্য করা অসম্ভব। অতএব তপোধন! যেখানে জানকী আছেন, আমাকে কৃপা করিয়া, অবিলম্বে সেই স্থলে সঙ্গে লইয়া চলুন। আমি নয়ন-জলে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া, আমার এই অপরিসীম দুষ্কৃতির কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব এবং তাঁহাকে সমাদরে সঙ্গে আনিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিব।"

মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন,—"মহারাজ! তোমার এই সাধু সঙ্কল্প অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। দেখিতেছি, তোমার মাতৃগণ ও পৌরনাঙ্গনাকুল জানকীর বিরহে নিতান্তই কাতরা হইয়াছেন; তোমার অনুজগণ, শোকার্ত্ত হইয়া, নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন; উপস্থিত ঋষি ও বিপ্র-মণ্ডলীর বদনে সবিশেষ বিষণ্ণ-ভাব প্রকটিত হইতেছে; সমবেত ভূপতিবৃন্দ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছেন, এবং তোমার প্রকৃতিপুঞ্জ নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। এরূপ সার্ব্বজনীন-সহানুভূতি স্থলে, সীতাকে পুনরানয়ন করিয়া, সকলের চিত্তে শান্তি-সংস্থাপন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। জানকী যাদৃশ-পুণ্য-শীলা, পতি-পরায়ণা ও পবিত্রতাময়ী জগতীতলে তদনুরূপ দৃষ্টান্তান্তর পরিদৃষ্ট হওয়া নিতান্তই সুকঠিন। সেই সতী-শিরোমণি সীতা সুন্দরীকে সদসদ্-বিবেচনা-শূন্য ব্যক্তি-বৃন্দের বাক্য-ক্রমে নির্ব্বাসিত করা কদাপি শ্রেয়ঃ কার্য্য হয় নাই। কিন্তু অতীতের জন্য অধুনা অনুশোচনা অনাবশ্যক। যাহা হইবার, হইয়াছে। অতঃপর মহারাজ! তুমি সীতাসহ, সিংহাসনে সমাসীন হইয়া, প্রজানুরঞ্জন সহকারে, রাজ-ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিলে, স্বজনাদি সুহৃদ্‌গণ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। তুমি

নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি কর; আমি অচিরে তোমার সীতাকে এই সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া দিব।”

রামচন্দ্র, কিয়ৎকাল অধোবদনে নীরব থাকিয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং অতিকাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—“অহো কঠোর—কঠোর কর্ত্তব্য! ভগবন্! ভবদুক্ত রাজ-ধর্ম্ম ও প্রজানুরঞ্জন এই দুই শেলোপম বাক্য আমার মর্ম্ম-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। যদি রাজ-ধর্ম্ম পালনই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হয়, যদি প্রজানুরঞ্জনই রাজার প্রিয়-ব্রত হয়, তাহা হইলে, হে পূজ্যপাদ, সহজে সীতাসহ সম্মিলনের সম্ভাবনা আর কোথায় রহিল? রাজ-ধর্ম্ম-পালনাভিপ্রায়ে ও প্রজানুরঞ্জনানুরোধে, নিরন্তর অসহনীয় মর্ম্ম-বেদনা সহ্য করিয়াও, যে কারণে সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়াছি, সে কারণ এখনও সমভাবেই বর্ত্তমান। সীতা আমার জীবন, সীতার স্মৃতি আমার অবিচ্ছিন্ন-সহচরী, আমার অন্তরাত্মা সীতার ধ্যানে পরিপূর্ণ, এবং আমি বৈদেহী-বিয়োগে মরণাপন্ন। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, সীতার অনবদ্য বরবপুঃ পুণ্য ও পবিত্রতার নিকেতন, তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাঙ্গীন সাধুতার আস্পদ, তিনি নারী-জাতির অলঙ্কার এবং সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের আধার। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও সীতা সম্বন্ধে কণিকামাত্র সন্দেহের স্থান নাই। সেই জন্যই, অদ্যাপি আমি জানকীর হিরণ্ময়ী মূর্ত্তির আরাধনা করিতেছি এবং নিরন্তর সীতাকে ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। কিন্তু, হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার অনুরক্ত ও পুত্রবৎ-পালনীয় প্রজাগণ সীতার চরিত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে অক্ষম। তাহারা সীতাকে কলঙ্কিতা বলিয়া বোধ করে এবং, রাজ্ঞীর

তথাবিধ চরিত্রানুকরণে, রাজ্যস্থ তাবৎ নারী কলুষিতা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। রাজ-ধর্ম্ম-পালন ও প্রজানুরঞ্জন যাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, এরূপ স্থলে সীতার সঙ্গ-শূন্য হওয়া, সেই রাজ-পদারূঢ় অভাগার পক্ষে অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সীতার সম্বন্ধীয় সেই দারুণ কলঙ্ক-কালিমা এখন পর্য্যন্ত সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং, এতাবৎকাল মধ্যে, তাঁহার সতীত্ব-সংক্রান্ত কোন অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত হয় নাই। তদীয় পবিত্রতা-সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতীতি উৎপাদনের কোনই উপকরণ আমাদের আয়ত্তাধীন নাই। সুতরাং বিহিত বিধানে, তাবৎ লোকের বিশ্বাস সমুৎপাদন না করিয়াই, যদি সীতাকে পুনর্গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে রাজ-ধর্ম্ম-পালন ও প্রজানুরঞ্জনরূপ প্রবল কর্ত্তব্য পদ-বিদলিত করা হইবে সুতরাং রামরাজ্য অনন্তকাল জগতীতলে কলঙ্কিত ও কুরাজ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। হে ভগবন্! বরং আমরণ আমি দুঃখের মুর্ম্মুর দাহনে বিদগ্ধ হইতে থাকিব, বরং যাবজ্জীবন আমি স্বগণসহ অরুন্তুদ বিষাদ-ভারে নিপীড়িত হইব, তথাপি সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য-পালনরূপ পবিত্র পন্থা হইতে পাদমাত্র বিচ্যুত হইয়া, অত্র কলঙ্ক ও পরত্র অধোগতি অর্জ্জন করিব না। স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, এবং এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া, আমি অনন্তকালস্থায়ী কুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিব না এবং, ধর্ম্মরূপ পরম ধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পারলৌকিক অধোগতির পথ মুক্ত করিব না। ইহ জগতে নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেই সতীকুল-কমলিনী সীতার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু সীতা-পতি

কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ, সীতা-পতি স্বার্থানুরোধে কুপথগামী, সীতা-পতি সদনুষ্ঠানের পরিপন্থী, ইত্যাকার মর্ম্মভেদী কটূক্তি শ্রবণ করার অপেক্ষা, সেই পতি-প্রাণা, ধর্ম্ম-ভীতা সীতার পক্ষে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণরূপ শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। হে মহর্ষে! আপনি সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিচারক। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, সীতাকে এ অবস্থায় পুনর্গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত কি না।"

তখন সেই বিশাল সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। সকলেই রামের অমানুষী ত্যাগ-স্বীকার, অত্যদ্ভুত কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং অতুলনীয় প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্গুণের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। প্রজাবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"ধন্য রাম-রাজ্য! ধন্য মহারাজ রামচন্দ্র! ধন্য রাম-রাজ্যের প্রজাগণ।

প্রজাগণের প্রশংসা-জনিত কলরবোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি বলিলেন,—"হে রঘুকুলোত্তম রামচন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার ন্যায় মহাজনেরই অনুরূপ। তুমি এমন সদ্বিবেচনার আধার না হইলে, সংসারে তোমার এত সমাদর কেন হইবে? জগতে তোমার ন্যায় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি আর কখনই রাজ-দণ্ড ধারণ করেন নাই। তোমার ন্যায় সাধু জনকে দর্শন করিলেও মনের শান্তি জন্মে। সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তুমি যে সম্পূর্ণরূপে সীতা-পরায়ণ সম্মুখস্থ ঐ স্বর্ণময়ী সীতা-মূর্ত্তিই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন! তোমার অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যানুরক্তিই সীতা-বর্জ্জনের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। সেই পবিত্র কর্ত্তব্য-পালনে স্খলিত-পদ হওয়া তোমার

পক্ষে নিতান্তই অশ্রেয়স্কর। তোমাকে তাদৃশ অসদনুষ্ঠানে পরামর্শ দিয়া, অধর্ম্মার্জ্জন করিতে, আমি কদাপি প্রস্তুত নহি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আত্মচরিত্র সমর্থনার্থ প্রকৃষ্ট প্রমাণ উত্থাপিত করিয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের ভ্রমাপনোদন করা সীতারই কর্ত্তব্য। সীতার বক্তব্য সীতা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া, যদি প্রজাবর্গের বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হন এবং যদি, বিহিত বিচারান্তে, তাঁহার পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে, সকলে সন্তুষ্ট মনে, সম্মতি প্রদান করে, তাহা হইলে, তাঁহাব পুনর্গ্রহণ-বিষয়ে তোমার আর কোনই আপত্তির কারণ থাকিবে না। তখন তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিলে, কোন প্রকার অকীর্ত্তি বা অধর্ম্ম সঞ্চিত হইবে না। হে মহারাজ! তুমি সমস্ত ভূপাল, ঋষি, ব্রাহ্মণ, এবং সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রজাকে এই সভায় উপস্থিত হইতে বলিয়া দেও। আমি, অনতিকাল মধ্যে, সীতার সহ এই স্থানে উপস্থিত হইব। সর্ব্বসমক্ষে সমাগতা সীতা, নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে সকলের সন্তোষ সমুৎপাদন করিয়া, প্রকৃতিবর্গের হৃদয় হইতে সন্দেহের বীজ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া দিবেন এবং নিশ্চয়ই তোমার সেই সহধর্ম্মিণী সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে তদীয় ঐ হৈম-প্রতিমা বিদূরিতা করতঃ, তোমার বামদেশে বিরাজমানা হইবেন।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে মহর্ষি বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। অশ্রু-সমাকুল-লোচন রামচন্দ্র, গদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“ভগবন্! এ অভাগা, চিরদুঃখী রামের অদৃষ্টে কি সে সৌভাগ্য আর ঘটিবে? আর কি এ জীবনে কদাপি জানকী-সহ সম্মিলন হইবে? রোদনই যাহার জীবনের সম্বল, বিষাদই যাহার চির-সহচর,

শোকই যাহার নিত্য-সাধনা, তাহার অদৃষ্টে কি আর সে আনন্দ দেখা দিবে? আপনার কৃপাই অধুনা আমার একমাত্র ভরসা স্থল। ভবাদৃশ মহাত্মা এ বিষয়ের উদ্যোগী এবং এ সম্বন্ধে অনুকূল, ইহাই এ ঘোর দুরাশা-তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে একমাত্র আলোক-বর্ত্তিকা।'

অতঃপর, অচিরে সভাস্থলে সীতা সমুপস্থিত হইয়া, আত্ম-চরিত্রের সততা সমর্থনার্থ প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন, এই সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া এবং সকলকে তদুপলক্ষে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া, সে দিন সভাভঙ্গ করা হইল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি বাল্মীকি, অবিলম্বে নৈমিষারণ্য হইতে প্রস্থান করতঃ, পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর সমীপস্থ, স্বীয় তপোবনে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় পতি-পরিত্যক্তা জানকী, মহারাজ রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় মহোৎসব-বিষয়ক সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য, নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত-চিত্তে, কালাতিপাত করিতেছিলেন। মহর্ষির আগমন মাত্র, সেই পুণ্যশীলা, ব্যথিত-হৃদয়া বালা, ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপস্থা হইয়া, ভক্তি-সহকারে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং, পতি-বিষয়ক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা-জনিত সঙ্কোচতা-নিবন্ধন, তাঁহার সম্মুখে, অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

সীতার হৃদয়-ভাব অনুমান করিয়া, বিচক্ষণোত্তম বাল্মীকি প্রথমতঃ সেই সুমহৎ ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষি-রাজের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সীতা যুগপৎ হর্ষ ও শোকে নিতান্ত অভিভূতা হইলেন এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ও অশ্রু-বেগ সংবরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইল। এতাদৃশ দশা-বিপর্য্যয় না ঘটিলে, যে মহামহোৎসবের তিনি প্রধান অধিনায়িকা হইতেন, দারুণ দুরদৃষ্ট-হেতু, অধুনা তিনি তাহার সমীপস্থ হইতেও অধিকারিণী নহেন! সহধর্ম্মিণীর সঙ্গ-ব্যতীত, এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার নহে; সুতরাং রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র সীতা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অবশ্যই দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া,

রঘুনাথ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সীতার সেই হৃদয়-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বগুণের আধার, প্রেমের প্রস্রবণ রামচন্দ্রের হৃদয় এখন অন্য মহিলা-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, মনে মনে এই বিশ্বাস সঞ্জাত হওয়ার পর হইতে, সীতার কষ্টের পরিসীমা ছিল না। রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও, তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, দুর্নিবার লোকাপবাদ হেতু ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-পালনানুরোধে, গুণ-ময় রামচন্দ্র তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সীতা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী সীতা, পার্থক্য-জনিত তীব্র জ্বালা, ধীর ভাবে সহ্য করিয়া, জীবন ধারণ করিতেছেন। অধুনা রাম-হৃদয় অন্য মহিলা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে; রামের বাম-দেশ অন্য সৌভাগ্যবতী সুন্দরী কর্ত্তৃক শোভিত হইতেছে; রামের যজ্ঞ-ক্রিয়ায় অন্য কোন পুণ্যবতী সঙ্গিনী হইয়াছেন; এই বিশ্বাস অন্তরে সমুদিত হওয়ার পর হইতে, জানকী জাহ্নবী-জলে জীবন-ত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। কেবল মহর্ষির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়, তিনি এখনও সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ব্রীড়াবনত-বদনা জনক-তনয়া, তপোধনের মুখে সেই সংবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, নীরবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

দূরদর্শী মহর্ষি, সীতার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া, বলিলেন,—"বৎসে! তোমার সেই লোকাতীত গুণ-সম্পন্ন স্বামী নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত মনুষ্য। তাঁহার অপরিসীম কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, তাঁহার প্রভূত প্রজা-বাৎসল্য, তাঁহার সবিশেষ বিচক্ষণতা সকলই অতুলনীয়। তাঁহার গরিষ্ঠ লৌকিক-ব্যবহার অনুপম সাধুতার পরিচায়ক। তিনি পুণ্যশীল-

গণের শীর্ষ-স্থানীয় এবং সর্ব্বথা প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহার পবিত্র চরিত্র জগতে আদর্শরূপে অনন্তকাল সমাদৃত ও সম্পূজিত হইবে। কল্যাণি! তুমি অপরিসীম সৌভাগ্যের বলে, সেই মহাপুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়াছ এবং এখনও সেই রাজ-হৃদয়ে, সিংহাসন স্থাপন করতঃ, রাজত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছ। অয়ি পতি-পরায়ণে! রামচন্দ্র তোমার বিয়োগে যৎ-পরোনাস্তি ব্যথিত ও নিরতিশয় মর্ম্মাহত। তোমার অদ-র্শন-জনিত শোকে তাঁহার নয়ন-যুগল নিয়ত জল-ভারাকুল। এই বৃহৎ ব্যাপারে বিনিবিষ্ট থাকিয়া এবং এই সুমহৎ উৎসব-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও, তিনি মুহূর্ত্তমাত্র তোমার চিন্তা হইতে বিরত নহেন। অধিক আর কি বলিব? বৎসে! তোমারই হৈমময়ী প্রতিমা, এই যজ্ঞ-ক্রিয়ায়, রামের একমাত্র সঙ্গিনী।”

সীতার সযত্ন-নিরুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ আর আবদ্ধ থাকিল না এবং গুরুজন-সকাশে চিরাভ্যস্ত লজ্জা অধুনা তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিল।

মহর্ষির বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে, গলদশ্রু-নয়না সীতা বলিয়া উঠিলেন,—‘হা কুটিল-হৃদয়ে, পাপীয়সি সীতে! তুই এখনই এমন অলৌকিক প্রেমময় আর্য্য-পুত্রকে হৃদয়-হীনতারূপ দারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছিলি! সেই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম-স্বরূপ রঘুনাথের উদারতায় সন্দেহ করিতে-ছিলি! তুই নিশ্চয়ই সেই মহাপুরুষের সম্পূর্ণ অযোগ্যা। চির-নির্ব্বাসন-রূপ কঠোর ব্যবস্থা কদাপি তোর পাপের অননু-রূপ দণ্ড নহে।’ তদনন্তর সবেগ-প্রবাহিত আনন্দাশ্রু বিমো-চন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“হা! আর্য্যপুত্র! হা

সীতা-বৎসল! এই অভাগী সীতাই তোমার চির-দুঃখের কারণ। পিতৃসত্য-পালনার্থ বন-বাস-কালে, আমারই জন্য, হৃদয়-ভেদী রোদন করিতে করিতে, অবশেষে তোমাকে অরণ্যচর শাখা-মৃগের শরণাগত হইতে হইয়াছিল; আমারই জন্য, তোমাকে সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ-বিধ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল; আমারই জন্য, তোমাকে অ-মূলক লোকাপবাদ হেতু দারুণ মনস্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং এখনও, এই পরিত্যক্তা ভাগ্যহীনার জন্য, তোমাকে না জানি, নিরন্তর কতই কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। এমন সীতার মরণই মঙ্গল! আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই সত্য; কারণ এ জগতে কবে কোন্ নারী তোমার ন্যায় ভূলোক-দুর্ল্লভ অপূর্ব্ব রত্ন বক্ষে ধারণ করিতে পাইয়াছে? কিন্তু এমন অসাধারণ স্বামী-রত্ন লাভ করিয়াও আমি প্রতি-নিয়ত তাঁহার যন্ত্রণারই কারণ হইলাম, একথা যখন আমার মনে হয়, তখনই তুষানলে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাসনা হয়।"

তখন মহর্ষি আবার বলিতে লাগিলেন,—"বৎসে! স্থির হও, আমার শুভ সংবাদের এখনও সমাপ্তি হয় নাই। তোমার সেই বিয়োগ-বিধুর পতির অভিপ্রায়ানুসারে, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া, তৎসহ সম্মিলিত করিয়া দিবার জন্য, আগমন করিয়াছি। তোমার যাতনা-যামিনীর অবসান হইয়াছে; এক্ষণে সুখময় সুপ্রভাত সমুপস্থিত। ত্বরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও; তোমাকে অবিলম্বে রামসহ সম্মিলিতা হইতে হইবে।"

সীতা শুনিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—"হা তাত! বলেন কি? এতদিন পরে কি আর্য্য-পুত্র তাঁহার এই পরিত্যক্তা চরণা-

শ্রিতা দাসীকে পুনরায় চরণে স্থান দিবেন স্থির করিয়াছেন? ভগবন্! আপনার কথা এই অভাগীর পক্ষে এতই শুভ যে, তাহা বিশ্বাস করিতেই ভয় হইতেছে। হায়! আমি কি জাগ্রত? সে অভাবনীয় সুখ কি এ জন্ম-দুঃখিনী জানকীর অদৃষ্টে আবার ঘটিবে? আবার কি আমি, এতদিন পরে, আর্য্য-পুত্রের চরণ-সেবা করিতে অধিকার লাভ করিব?”

মহর্ষি বলিলেন,—“বৎসে জানকি! আশ্বস্তা হও। তোমার অবিদিত নাই যে, রামচন্দ্র প্রকৃতি-বর্গের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্যই, তোমাকে বনে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে প্রকৃতিবর্গ, অ-মূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, তোমার সম্বন্ধে নিতান্ত ঘৃণাজনক কুৎসা রটনা করিয়াছিল, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য, রামকে, কর্ত্তব্যানুরোধে, তোমার সঙ্গ-শূন্য হইয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। কেবল তাহাদেরই মুখাপেক্ষী হইয়া, প্রবল বাসনা-সত্ত্বেও, রাম তোমাকে গ্রহণ করিতে অশক্ত। তোমার প্রতি তাহারা সেই অতি কুৎসিৎ সন্দেহ আরোপ করিলে, এপর্য্যন্ত তাহাদের ভ্রমাপনোদনের জন্য, কেহই কোন কথা বলেন নাই। রামচন্দ্র এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্; বশিষ্ঠাদি হিতৈষী ঋষিগণও স্তব্ধ; তুমিত বনবাসিনী। তৎকালে একবার প্রজাগণকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইবার প্রযত্ন করিলে, একবার যুক্তি দ্বারা তোমার অলৌকিক গুণের কথা সমর্থন করিলে, একবার তাহাদের সন্দেহের অমূলকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিলে, তখনই, অতি সহজেই, সকল বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হইয়া যাইত এবং এতাদৃশ বিষাদ-জনক ব্যাপারের আবির্ভাব হইত না। বৎসে! এতদিন পরে তখনকার সেই ভ্রম-সংশোধনের সমুচিত সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

এই মহতী অশ্বমেধ-সভায় যাবতীয় ভূপাল, ঋষি, ব্রাহ্মণ, প্রজা, প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। এই সভায় তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি উপস্থিত হইব এবং আমি স্বয়ং, ধর্ম্মকে স্বাক্ষী করিয়া, তোমার পাতিব্রত্য ও অপাংশুলতার সমর্থন করিব। তোমার এই অপাপ-বিদ্ধ, পুণ্য-জ্যোতিঃ-পরিপূর্ণ বরণীয় বপুঃ সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া এবং আমার সেই অন্তরোদ্ভূত বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, যদি কাহারও হৃদয়-মধ্যে তোমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নিহিত থাকে, তাহাও নিশ্চয়ই তৎ-ক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া যাইবে। জনক-নন্দিনি! আমি রাম-চন্দ্রের অনুরোধানুসারে, তাঁহাকে সকল পরামর্শ বিদিত করিয়া, তোমাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। অতএব বৎসে! আর কাল-ব্যাজ করিও না। রঘুনাথ, তোমার জন্য, নিতান্ত কাতর-ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন; এক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার ক্লেশাপনোদনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।"

তদনন্তর মহর্ষি মুনি-কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন এবং জানকীকে, পতি-গৃহ যাত্রার জন্য, প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা, মহানন্দে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া, ঈষদ্ধাস্য সহকারে, আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কেহ বা এতদিনের পর সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হইল ভাবিয়া হস্ত দ্বারা বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অপরিসীম আনন্দ হেতু, সীতা তখন কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামীসহ সম্মিলন সম্বন্ধে মহর্ষি যে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন তাহা অমোঘ। তাঁহাকে দেখিয়া, বা তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া কাহারও বিশ্বাসের অন্যথা না হইতেও পারে; এই ধর্ম্ম-ব্রত, জ্ঞান-দীপ্ত,

মহাতেজাঃ মহর্ষি বাল্মীকির সমর্থনোক্তি উপেক্ষা করিতে সাহসী হইবে, এমন লোক বর্ত্তমান কালে দেখিতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং, এতদিনের পর, নিশ্চয়ই প্রজাগণের ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং নিশ্চয়ই তিনি রাম কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা হইবেন সন্দেহ নাই। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর হইতে, স্মিত-বিকসিতাননা সীতা আনন্দ-বিহ্বলা হইয়া উঠিলেন। মুনি-কন্যারা তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, তাঁহার সংজ্ঞা হইল এবং তখন গুরু-আনন্দ হেতুক তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখনই মুনি-কন্যারা, সযত্নে তাঁহার নয়ন-মার্জ্জন করিয়া দিয়া, তাঁহাকে তাঁহার নিজ কুটীরে লইয়া চলিলেন।

রাম-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, কিরূপে তিনি রামের চরণে প্রণাম করিবেন; কিরূপে কানকী জানকী মূর্ত্তির সহিত সপত্নীত্ব সংস্থাপন করিয়া, তিনি রামচন্দ্রকে পরিহাস করিবেন; কিরূপে কুশীলবকে ক্রোড়ে লইয়া, তিনি রামচন্দ্রকে তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিবেন; কিরূপে কৌশল্যাদি স্নেহময়ী শ্বশ্রূগণ সমীপে স্বকীয় অদৃষ্টের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাদের ক্লেশ-ভারের লাঘব করিবেন; কিরূপে লক্ষ্মণাদি দেবরগণের সহিত নানাবিষয়ক বাক্যালাপ করিবেন; কিরূপে পুনরায় তপোবন-দর্শনেচ্ছা ব্যক্ত করিয়া ভ্রাতৃ-ভক্তি-মুগ্ধ লক্ষ্মণের সহিত রহস্য করিবেন এবং কিরূপে ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি ভগিনীগণের সমক্ষে অরণ্য-বাস বৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিবেন ইত্যাদি বহুবিধ সুখময়ী কল্পনার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এ দিকে মহারাজ রামচন্দ্র মনে মনে বিচার করিলেন যখন মহর্ষি বাল্মীকি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জানকী স্বীয় অপাংশুলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রজাবর্গের প্রতীতি উৎপাদনে সক্ষম হইবেন, তখন আর সে সম্বন্ধে কোনই আশঙ্কার কারণ নাই। অমিত-তেজাঃ, প্রতিভা-প্রভাব-প্রদীপ্ত, প্রতিষ্ঠিত-যশোরাশি, হৃদয়-বল-সম্পন্ন, মহামনাঃ মহর্ষি বাল্মীকি যখন এই ঘনাবর্ত্তময় সাগর-গর্ভে মজ্জমানা তরণীর কর্ণ ধারণ করিয়াছেন, তখন ইহা যে যাবতীয় বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া,অনায়াসে শান্তি-তটে আসিয়া সংলগ্ন হইবে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। আশার এই মধুর আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া, রামচন্দ্র মনে মনে অনবরত নানাবিধ প্রীতি-প্রদ কল্পনার প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন,—"আমি সীতার সহিত যেরূপ হৃদয়-হীন ব্যবহার করিয়াছি, তাহা প্রায়শ্চিত্তাতীত হইলেও, প্রথমেই আমাকে তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত-প্রায় হইয়া তদীয় প্রীতি ও প্রসাদ লাভের প্রযত্ন করিতে হইবে! মুক্তকণ্ঠে, সর্ব্ব-সমক্ষে নির্ম্মমতা ও পরুষতার কথা স্বয়ং স্বীকার করিয়া, সেই সরলা বালার নিকটে সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিব। আমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য হইলেও, সেই শান্তি-স্বরূপা সুশীলা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন! তদনন্তর আমি সেই সুন্দরী-শিরোমণিকে স্বর্ণ-সিংহাসনে সমুপবিষ্টা করিয়া, তাঁহার সুখ-সংবিধানে নিবিষ্ট-চিত্ত হইব। অতঃপর তাঁহার বাসনা-পূরণ করাই আমার জীব-

নের প্রিয়ব্রত হইবে। তাঁহার বদনারবিন্দে স্বেদ-বারি বিগলিত হইলে, আমি স্বহস্তে তাহা মুক্ত করিব ও বৃন্ত-বীজন করিয়া, তাঁহাকে বিগতক্লম করিব। তাঁহারই সন্তোষ-সাধনার্থ যাবতীয় ধন-রত্ন ও দাস-দাসী নিয়োজিত থাকিবে। তাঁহার রসনা-তৃপ্তির জন্য, জগতে যেখানে যে সুরস পদার্থ প্রাপ্তব্য আমি সযত্নে তৎসমস্ত সঞ্চয় করিব; তাঁহার ভোগাভিলাষ পরিতৃপ্তির নিমিত্ত, আমি ভূ-ভাণ্ডারস্থ প্রত্যেক প্রীতিপ্রদ-পদার্থ সংগ্রহ করিব এবং আমরণ কায়মনোবাক্যে তাঁহারই বিনোদনে বিনিযুক্ত থাকিব। তিনি নিদ্রিত হইলে, আমি, জাগ্রত থাকিয়া, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব ও, তদীয় পার্শ্বোপবিষ্ট হইয়া, সর্ব্ববিধ আপৎপাত হইতে, তাঁহার সেই নবনীত-বিনিন্দিত কোমল কলেবর রক্ষিত করিতে থাকিব; তিনি জাগ্রতী থাকিলে, পরম-প্রেমাস্পদ প্রিয়পুত্র-দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, প্রমোদ-প্রসঙ্গালাপে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিব।

"এইরূপ সুখ-সেবায় সীতার কাতর দেহ ও মন অচিরকাল মধ্যে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে, আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেশ-ভ্রমণে যাত্রা করিব। বহু যান-বাহন, দাস-দাসী এবং সুখ-সংবিধায়ক সামগ্রী-সমূহ আমাদের সঙ্গে থাকিবে। পরম পূজনীয় মাতৃগণ, পরম স্নেহাস্পদ অনুজগণ এবং জানকীর ভগ্নীগণকেও সঙ্গে লইতে হইবে। অরণ্য-বাস কালে যে যে পরম রমণীয় দৃশ্যমধ্যে আমরা পর্য্যটন করিয়াছি; যে যে নয়ন-রঞ্জন মনোহর স্থানে আমরা সুখে বা দুঃখে কালাতিপাত করিয়াছি; যে যে বিপদাকীর্ণ ক্ষেত্র আমরা সভয়ে অতিক্রম করিয়াছি; তত্তৎ পূর্ব্ব-স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানে পুনরায় উপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই সীতা নিরতিশয় হর্ষান্বিতা হইবেন। সেই সেই স্থলে

বল্কল-বসনা, সেবক-বিহীনা সীতা বহুতর কষ্টে কাল-কর্ত্তন করিয়াছেন; তত্তৎস্থলে অধুনা সর্ব্ব-সুখ-সংবেষ্টিতা হইয়া, সমুপস্থিত হইলে, নিশ্চয়ই তৎসমস্ত মধুরতর রূপে তাঁহাকে বিনোদিত করিবে। পূজ্যপাদ ভরদ্বাজ মুনির পবিত্র আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণান্তর, চিত্রকূট নামক রম্য পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা-কালে, অধ্ব-শ্রম-ক্লিষ্টা, কম্পিত-কলেবরা জানকী যমুনা-তীরস্থ যে শ্যামবট-তলে, আমার বক্ষঃ-স্থলে মস্তক স্থাপন করিয়া, নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, পুনরায় সেই স্থান তাঁহাকে দেখাইতে পারিলে, না জানি তাঁহার কি আনন্দই জন্মিবে! শ্যাম-সলিলা গোদাবরী সন্নিহিত, জন-স্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ নামক মনোহর গিরি-পৃষ্ঠে সীতার স্বচ্ছন্দ-সঞ্চার ও সানন্দ ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে, সেই দৃশ্য-মধ্যে তিনি পুনঃ-স্থাপিতা হইলে, প্রকৃতই তাঁহার পুলকের পরিসীমা থাকিবে না। যে পঞ্চবটী বনে সীতা, মৃগ-করভাদিকে পরিবার-স্বরূপ করিয়া, সুখময় সংসার সঙ্গঠিত করিয়াছিলেন এবং, যে স্থলে, দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসগণের বৈরিতায়, আমাদের অচিন্তনীয় বিপৎ-পাত সংঘটিত না হইলে, আমরা পরম সুখে নিয়মিত প্রবাস-কাল অতিবাহিত করিতাম, সেই বহুবিধ স্মৃতি-উদ্দীপক স্থানে উপস্থিত হইলে, সীতার সবিশেষ সন্তোষ জন্মিবে সন্দেহ নাই।" এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে রামচন্দ্রের আবার মনে হইল,—"কিন্তু আমি যেরূপ পাতকী তাহাতে, এ সকল পরম সুখ কখনই কি আমার অদৃষ্টে ঘটিতে পারে? অহো! আমি কুহকিনী আশার মোহে জাগ্রত-স্বপ্ন দেখিতেছি! সীতা-সম্মিলন-সুখ, এ অভাগার অদৃষ্টে, কখনই ঘটিতে পারে না। যে দুরাচার স্বেচ্ছায় স্বকরস্থ পরমরত্ন অতল

জলধি-জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, যে নারকী পরুষ আঘাতে প্রেম-বন্ধনের মূলচ্ছেদ করিয়াছে, যে চণ্ডাল পূর্ণ বিশ্বাসের অত্যদ্ভুত অপব্যবহার করিয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি-সঞ্চয় করিয়াছে, যে নরাধম বক্ষঃস্থ অমূল্য মণি বিচ্ছিন্ন করিয়া পদ-বিদলিত করিয়াছে, সে কোন্ সাহসে পুনরায় সেই সকল সৌভাগ্যের কামনা করে? কোন্ অধিকার-বলে সে আবার সেই সকল স্বেচ্ছা-পরিত্যক্ত সুখ-ভোগের প্রয়াসী হয়? হা হত-ভাগ্য, নির্লজ্জ রাম! নিশ্চয়ই তুই মনুষ্য-নামের নিতান্ত অযোগ্য। নিশ্চয়ই বজ্র, পাষাণ ও আয়স দ্বারা তোর হৃদয় গঠিত। যদি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায়, প্রাকৃতিক উপাদানে তোর হৃদয় বিরচিত হইত, তাহা হইলে, অবশ্যই সীতার নাম গ্রহণ সময়ে, তাহা লজ্জায় ও ক্ষোভে মথিত ও অবসন্ন হইত।”

কিয়ৎকাল নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিয়া, রাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন,—“সীতার সে অমৃত-নিস্যন্দিনী মধুময়ী বাক্য-পরম্পরা এ বজ্র-হৃদয় রামের কর্ণে আর কখনই প্রবেশ করিবে না, তাঁহার সেই সৌকুমার্য্যময়ী স্বর্ণ-কান্তি এ পাষাণ-প্রাণ রামের আর কখনই নয়ন-গোচর হইবে না, তাঁহার সেই ভূলোক-দুর্লভ সঙ্গ-সুখ এ দুর্জ্জন রাম আর কখনই ভোগ করিতে পাইবে না। অহো! কি পরিতাপ!”

তৎক্ষণাৎ আবার মহর্ষির আশ্বাস-বাক্য স্মরণ-পথে সমুদিত হওয়ায়, রামচন্দ্রের বদন-মণ্ডল হইতে বিষাদ-কালিমা কিঞ্চিৎ তিরোহিত হইল এবং তথায় ঈষৎ আনন্দ-জ্যোতিঃ প্রকটিত হইতে লাগিল। তিনি এইরূপে হর্ষ ও শোকোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে, অস্থির ভাবে সীতা-সমাগম কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ সম্মিলিত হইয়া, সীতার পুনর্গ্রহণ উপলক্ষে, কিরূপ মহোৎসবের আয়োজন করিতে হইবে, তাহারই পরামর্শ করিতেছিলেন। সীতাকে তিনিই ঘোরারণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই কথা স্মরণ করিয়া, লক্ষ্মণ, এই পরমানন্দের মধ্যেও, লজ্জায় ম্রিয়মাণ এবং কোন্ মুখে তিনি আবার সীতার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম করিবেন তাহাই ভাবিয়া, আকুল।

পুরমধ্যে কৌশল্যা ও তাঁহার সপত্নীগণ, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে সীতার আগমন-কাল-গণনা করিতেছিলেন। কখন বা অবিলম্বে সীতাকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া এবং তাঁহার বদন-চুম্বন করিয়া, সকল অন্তর্দাহের শান্তি করিব ভাবিয়া তাঁহারা মহানন্দে মগ্না; আবার কখন বা সীতার এই সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বানচর্য্য-জনিত নানাবিধ অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা কল্পনা করিয়া রোরুদ্যমানা। প্রবল-প্রতাপ-জনক-রাজ-নন্দিনী, ভুবন-বিখ্যাত মহারাজ দশরথের পুত্র-বধূ এবং মহাপরাক্রান্ত মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী এতাবৎকাল তপোবন-সুলভ ফল-মূল সেবন করতঃ, জীবন ধারণ করিয়া আছেন, এ কথা চিন্তা করিয়া, তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলেন এবং, সীতাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত, নানাপ্রকার সুখ-সেব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অন্যত্র উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি জানকীর এই ভগিনী অথচ যাতৃগণ, আগত-প্রায়া জ্যেষ্ঠার জন্য, নানাবিধ সৌগন্ধ সামগ্রী ও বসন-ভূষণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। তিনি উপস্থিত হইলে, প্রথমে কিরূপে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে

হইবে এবং পরে সেই তপোধন-বাস-ক্লিষ্টা রুক্ষ-কেশা সীতার কিরূপে কবরী বন্ধন করিতে হইবে, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর দেহের কোথায় কিরূপ ভূষণ প্রদান করিতে হইবে, সেই চম্পক-কুসুম-সন্নিভ কোমলাঙ্গীর কলেবর কিরূপ বসনে আবৃত করিতে হইবে, তাহারই আলোচনায় মগ্ন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্য জানকী, বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাবৎ লোকের হৃদয় হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধীয় অমূলক কুসংস্কার বিদূরিত করিবেন এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে পুনরায় পরিগ্রহ করিবেন, এই সংবাদ সর্ব্বত্র সংঘোষিত হওয়ায়, নিয়মিত সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই, কৌতূহলাক্রান্ত লোক-সমাগমে, নৈমিষারণ্যস্থ সেই সভাস্থল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, মার্কণ্ডেয় মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, শক্তি, শতানন্দ, ভার্গব, ভরদ্বাজ, নারদ, গৌতম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক ঋষি, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, নানা জনপদের রাজণ্যগণ এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম নিরত ব্যক্তিবৃন্দও আগমন করিলেন। সকলেই সমুৎসাহে ও সানন্দে সীতার আগমন কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি, যথাসময়ে জানকীকে সঙ্গে লইয়া, সেই লোকাকীর্ণ, অথচ নিস্তব্ধ, সভা-মণ্ডপে সমাগত হইলেন। ক্লেশ-প্রপীড়িতা সীতা নিতান্ত ক্ষীণ-কলেবরা ও, শোণিত-হীনতা হেতু, পাণ্ডু-বর্ণা। তিনি ভূষণ-বিহীনা, রুক্ষ-কেশা, মলিনা ও তাপস-তনয়-বেশ-ধারিণী। শরৎকালের প্রচণ্ড আতপ-তাপে যেমন কেতকীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ পত্রও বিশুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ নিদারুণ বনবাস হেতু সীতা-লতিকা শ্রী-হীনা, মলিনা ও বিশুষ্কা হইয়াছেন। সেই কম্পান্বিত-কলেবরা, কাতরা

সীতাকে, ধীরে ধীরে ও অবনত মস্তকে, সভা মধ্যে আসিতে দেখিয়া, সকলেরই মনে হইল যেন করুণ-রসই শরীর পরিগ্রহ করিয়া, সেই সভায় প্রবেশ করিতেছেন। এক্ষণে এই অবসন্নাবয়বা, নিতান্ত নির্ব্বিন্না সীতাকে দেখিয়া, দর্শকগণের সেই সযত্ন সংরক্ষিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং সেই সভা মধ্যে, আন্তরিক শোক-বিজ্ঞাপক তুমুল কোলাহল সমুখিত হইল।

সীতাকে দর্শনমাত্র রামচন্দ্রের মনে হইল, "আর কথায় কি প্রয়োজন? অনর্থক কালাপহরণের কি আবশ্যক? এখনই সীতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সিংহাসনে সংস্থাপিত করি।" কিন্তু তখনই মনে করিলেন, "কঠোর—কঠোর কর্ত্তব্য পালনে আমি বাধ্য। রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্র প্রজার দাসমাত্র। বিধাতঃ! এই দারুণ অসময়ে—চিত্তের এই ঘোর উন্মত্তবৎ চঞ্চল অবস্থায়, আমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর, এ অভাগাকে অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য-সাধনে সক্ষম কর।" তিনি এই বিষম সময়ে, অমানুষ-ধৈর্য্য-সহকারে, অটল গিরির ন্যায়, সেই সিংহাসনে স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন।

সভার কোলাহল মন্দীভূত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"মহারাজ রামচন্দ্র! নির্ব্বাসনের পর হইতে, এতাবৎকাল তোমার সহধর্ম্মিণী সীতা আমারই আশ্রমে বাস করিতেছেন। অমূলক লোকাপবাদ ভয়ে, বিশুদ্ধ-স্বভাবা জানকীকে বিবাসিত করিয়া, তুমি সম্যক্ রূপে রাজধর্ম্মের পালন ও প্রজানুরঞ্জন করিয়াছ সত্য, কিন্তু সাক্ষাৎ সতীত্ব-স্বরূপা সীতার প্রতি তদ্ধেতু নিরতিশয় অবিচার ও অত্যাচার করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। হে রাজন্!

ধর্ম্ম-চর্চ্চাই আমার জীবনের অবলম্বন, পারলৌকিক নিশ্রেয়োন্বেষণই আমার একমাত্র লক্ষ্য, মায়া-মোহাদি পরিশূন্য হওয়াই আমার প্রধান চেষ্টা এবং কায়মনোবাক্যে সত্যানুষ্ঠান করাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। সেই সাধন-পথাবলম্বিত, মুক্তিকাম, বাঙ্‌নিষ্ঠ, বাল্মীকি, এই মহতী সভা মধ্যে, অদ্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, যে এই রাম-সীমন্তিনী সীতা সুন্দরী সম্পূর্ণরূপ সাধ্বী ও সত্য-পরায়ণা। ইনি লোকাতীত সদ্‌গুণ-সমূহের নিকেতন এবং বামা-কুলের অলঙ্কার-স্বরূপা। ইনি সর্ব্বথা পাপ-সংস্পর্শ-বিহীনা এবং মূর্ত্তিমতী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-স্বরূপা। হে সভাস্থ ঋষি-মণ্ডলি! হে সভাস্থ বিপ্র-মণ্ডলি! হে সভাস্থ নরপতিগণ! আমি আপনাদের সমক্ষে, সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিতেছি যে, এই সীতা সম্পুর্ণরূপ শুদ্ধ-চারিণী এবং সাক্ষাৎ পুণ্য-প্রতিমা। হে মহারাজ রামচন্দ্র! তুমি অতঃপর হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। তোমার অনুগত ও বাৎসল্য-মুগ্ধ প্রজাগণ এবং হিত-কাম সুহৃদ্‌গণ অতঃপর সীতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে তোমার ঔরসজাত এই সুকুমার-কায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সন্তানদ্বয় সহ, সর্ব্ব গুণের আধার-স্বরূপা সহধর্ম্মিণী সীতাকে পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্ববিধ সুখসম্ভোগ করিতে করিতে সুদীর্ঘ কাল সিংহাসনে সমাসীন থাক এবং জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, সর্ব্বত্র আনন্দ বিস্তার করিতে থাক।"

মহর্ষি বাল্মীকি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, সেই সভা-মধ্যে পুনরায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য তাবৎ ব্যক্তি "জয়, মহর্ষি বাল্মীকির জয়!" "জয় সীতাদেবীর

জয়! জয়, মহারাজ রামচন্দ্রের জয়!” ইত্যাদিরূপ জয়-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

সেই কোলাহল ক্ষান্ত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মহর্ষি বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“ভক্তিভাজন মহর্ষে! সীতাদেবী যে মূর্ত্তিময়ী সতী-স্বরূপা এবং তাঁহার চরিত্র যে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তৎসম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সীতা সুদীর্ঘ কাল রাবণ-গৃহে নিবাস করিয়াছিলেন। আমি, মহাহবে রাবণকে নিহত করিয়া, সীতার সতীত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপ বিশ্বাস-জনক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছি এবং তদনন্তর সীতাকে পরিগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সেই প্রমাণাদি ব্যাপার সুদূরে, সমুদ্র-পারে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সুতরাং অত্রত্য প্রজাপুঞ্জের তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। তাহারা, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা হেতু, নিষ্পাপ-হৃদয়া সীতার সম্বন্ধে নানাবিধ বীভৎস সন্দেহ পোষণ করিয়া রাখিয়াছে এবং, সেই জন্য, সময়ে সময়ে, তাহারা স্ব স্ব পরিজন মধ্যে, রাজ-মহিষীর নৈতিক চরিত্র উপলক্ষ করিয়া, বহু-প্রকার জল্পনা করিয়া থাকে। সে সকল প্রসঙ্গ সর্ব্বথা অমূলক হইলেও, রাজ্য-মধ্যে দারুণ দুর্নীতি প্রচারের কারণ এবং চির-গৌরবান্বিত রঘু-বংশের পক্ষে নিরতিশয় গ্লানি-জনক। যাহাতে রাজ্য-মধ্যে দুর্নীতির প্রচার হয়, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে রাজ-ভক্তি শিথিল-মূল হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান পরিহার করা রাজ-পদারূঢ় ব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য। সেই অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যানুরোধে, অনন্যোপায় হইয়া, আমার জীবন-স্বরূপা সীতাকে আমি বিবাসিতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া, সুখ-সেবনীয়া সীতা যে অদ্যাপি জীবিতা

আছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সপুত্র সীতার পুনঃ সন্দর্শন-লাভ এ অভাগা চিরদুঃখী রামের পক্ষে স্বপ্নাতীত সুখ-প্রদ। কিন্তু দেব! আমি কঠোর কর্ত্তব্যের দাস মাত্র। রাজ্য-মধ্যে অবশ্যম্ভাবী দুর্নীতি-স্রোত নিরুদ্ধ করিবার অভি-প্রায়ে, প্রকৃতি-পুঞ্জের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ, মহামহিম রঘু-বংশের যশঃ-সুধাকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, যে হৃদয়ভেদিনী পৈশাচিকী ক্রিয়া আমি সম্পন্ন করিয়াছি, তাহার কোনই প্রতীকার অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে লজ্জাকর লোকাপ-বাদ-বশতঃ, আমি কণক-লতিকা জানকীকে বিবাসিত করিয়া-ছিলাম তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার কোনই আয়োজন হয় নাই। তাবৎলোকের প্রতীতি-জনক ও সন্দেহাপনোদক কোন বিশিষ্ট প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া, আমি সীতা সুন্দরীকে পুনঃ-পরিগ্রহ করিলে, প্রজাবর্গ, যে অমূলক কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষেপ করিয়া, বিমল রঘু-কুল কলঙ্কিত করিতেছিল, পুনরায় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অধিকন্তু যে কারণে সীতা-বর্জ্জন করিয়াছিলাম সেই কারণ সম্পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকিতে, পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলে, মানব-সমাজ আমাকে নিতান্ত চপল-চিত্ত উন্মত্ত বোধে পরিহাস করিতে থাকিবে এবং, সীতাশূন্য হইয়া, এতাবৎকাল আমি যে বিজাতীয় যাতনানলে বিদগ্ধ হইতেছি, তাহা উদ্দেশ্য-বিহীন ভস্মাহুতি-রূপে পরিগণিত হইবে। অতএব হে বিচার-নিপুণ, কর্ত্তব্যাভিজ্ঞ, দূরদর্শিন্, মহর্ষে! আপনি কৃপা-সহকারে, সীতাকে এই সমবেত সভ্য-মণ্ডলীর সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদী ও প্রতীতি-জনক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়া, এ অধম রামের বহ্নি-চর্ব্বিত-জীবনকে আবার সজীব করুন, এ বিপদ-ভারাবনত রামকে আবার

নিরাপদ করুন, এ মরুভূমি-তুল্য রাম-হৃদয় আবার ফল-পুষ্প-পল্লব-পত্রাদি পরিপূরিত শোভনোদ্যানে পরিণত করুন।"

তখন সভাস্থ সকলেই রামচন্দ্রের অত্যাশ্চার্য্য সদ্বিবেচনা ও সহৃদয়তার ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। রাম-চন্দ্রের কথা সাঙ্গ হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি বলিলেন,—"ধন্য মহা-রাজ রামচন্দ্র! তোমার ন্যায় প্রজানুরক্ত ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভূপতি বোধ করি আর কখনই এ বসুন্ধরায় আবির্ভূত হন নাই। তোমার ন্যায় সদ্বিবেচনাশীল ব্যক্তি বোধ হয় এ ভূতলে আর কখনই জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই।" তদনন্তর সীতার অভিমুখে বদনাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—"বৎসে! তোমার এই লোকাতীত গুণ-সম্পন্ন পুণ্যময় পবিত্র পতি যাহা বলিলেন তাহা অবশ্যই তুমি শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে তৎ-সম্বন্ধে তোমার যাহা বক্তব্য তাহা এই সভা-মধ্যে ব্যক্ত কর।"

তখন সেই বায়ু-বিতাড়িত বেতসবৎ বিকম্পিতা, সজল-নয়না সীতা, ঊর্দ্ধনেত্রা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,— 'হে সভাস্থ বন্দনীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিবৃন্দ! যে সীতার শরীরের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে রাম-মূর্ত্তি বিরাজিত; যে সীতা শয়নে বা স্বপ্নে, কার্য্যে বা অকার্য্যে, কদাপি রাম-চিন্তায় বিরত হইতে পারে না; যে সীতা, ইষ্টদেবতার পূজা করিতে উপ-বিষ্ট হইয়া, সংগৃহীত পুষ্প-চন্দনাদি-সহকারে, নিরন্তর কেবল রাম-চরণেরই পূজা করিয়াছে; পদ্ম-পলাশ-লোচন রামচন্দ্রের নয়নান্তরালে থাকিলে যে সীতার, অন্তরাত্মা, মকরন্দ-লোলুপ ভৃঙ্গের ন্যায়, নিরন্তর রাম-চরণাম্বুজের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়া-ইয়াছে; ঐ সিংহাসনাসীন সুশ্যামল-কান্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষই যে সীতার ধ্যান ও জ্ঞানের একমাত্র বিষয়ীভূত, সেই সীতা এই

সভামধ্যে স্বীয় সততা-সম্বন্ধে আর কি শপথ গ্রহণ করিবে? শপথ সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন হইলেও, লোক-প্রতীতির অনুরোধে, সীতা আজি এই সুবিশাল সভামধ্যে সর্ব্ব-সমক্ষে মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছে যে, যদি জীবন্মধ্যে কদাপি ভ্রমে, বা পরিহাস-চ্ছলেও, ঐ সীতা-পতি ভিন্ন অন্য কোন মানব-মূর্ত্তি, মুহূর্ত্ত-কালের নিমিত্তও তাহার মানস-পথে সমুদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে যেন [illegible] রাম-চরণ সন্দর্শন করিতে না পায়। এতদপেক্ষা গুরুতর ও কঠিনতর শপথ এ অভাগিনী আর কিছুই জানে না। হা জানকীবল্লভ! হা সীতার সর্ব্বস্বধন! হা অভাগিনীর অত্র আনন্দ ও অমুত্র মুক্তি-বিধায়ক পরমদেবতা! এ জীবনে তোমার চরণযুগল এ জন্মদুঃখিনী জানকী আবার দেখিতে পাইল, ইহাই তাহার পক্ষে পরম-তৃপ্তি। ইহ জীবনে সীতার আর কোন কামনা নাই। সীতার বাসনা-তরু বিশুষ্ক হইয়াছে; সীতার সাধের সৌধ বিচূর্ণিত হইয়াছে। এই অন্তিম কালে, এ অভাগিনী ভগবানের নিকট কেবল এই প্রার্থনা করিতেছে, যেন জন্ম-জন্মান্তরেও ঐ গুণময় রামচন্দ্রকে সে স্বামীস্বরূপে লাভ করিয়া তাঁহার চরণ-সেবার অধিকারিণী হয় এবং পরমপ্রীতি-ভাজন, সর্ব্বগুণের আধার, সীতার দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ, লক্ষ্মণকে সে যেন দেবর-রূপে লাভ করে। সীতার নয়ন-মণি রামচন্দ্র! তোমার তনয়, রাজ-নন্দন হইয়াও, বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতেছিল; এক্ষণে তাহারা তোমারই আশ্রিত হইয়াছে; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে অভাগিনী সীতা তোমার চরণ হইতে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। এ অন্তিম কালে এ কি সৌভাগ্য! হা রাম! এ দাসীর প্রতি তোমার কি অপরিসীম কৃপা! একি জগৎ যে আমার চক্ষে

রামময়! আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে আমার পার্শ্বে ও ঊর্দ্ধে, আমার অন্তরে ও বাহ্যে কেবলই তোমার মোহিনী মূর্ত্তি! হা রাম! কে বলে তুমি আমার নিকটস্থ নও? কে বলে আমি তোমার নির্ব্বাসিতা দুঃখিনী সীতা? এই যে—এই যে আমার উভয় বাহুর অন্তরালে ভুবনালোক রামচন্দ্র বিরাজমান! হা নাথ! তোমাকে এ বাহু-মধ্য হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে দিব না; আর এ অভাগিনী সীতা কদাপি তোমার সঙ্গ-শূন্যা হইবে না। হা নিষ্ঠুর! চরণাশ্রিতা দাসীকে কি এমনই করিয়া কাঁদাইতে হয়? হা দয়াময়! দুঃখিনীকে কি এমনই করিয়া দয়া করিতে হয়? একি! কোথায় রামচন্দ্র? আমার বাহু-পাশ ছিন্ন করিয়া, রঘুনাথ কোথায় তুমি? ঐ যে—ঐ যে শঠ! তুমি দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছ! কিন্তু ওকি! প্রাণেশ্বর! তোমার বামে ও কোন্ সৌভাগ্যবতী? ও কি—ও যে আমি—ওযে তোমার এই দাসীরই মূর্ত্তি! দূর কর—দয়াময় দূর কর—আমার মূর্ত্তিও তোমার পার্শ্বে আমি সহিতে পারি না। দূর কর! সীতাপতি! তোমার দাসী যে চরণে! হা রামচন্দ্র! হা দয়া-সিন্ধো! হা দুঃখিনী-হৃদয়-বল্লভ! পুনরায় আমার বাহুমধ্যে আগমন কর—আমাকে ধর! হা রাম—হা রাম—হা রাম—" বলিতে বলিতে কম্পান্বিতা সীতা, ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায়, ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিতা হইলেন।

সংজ্ঞা-শূন্যা সীতা ভূ-পতিতা হইবার পূর্ব্বেই, রামচন্দ্র, "হা প্রিয়ে জানকি! স্থির হও। এই যে তোমার রাম তোমার সমীপে উপস্থিত।" বলিয়া সীতার সন্নিকটে সমাগত হইলেন। অপর দিক্ হইতে বাৎসল্য-বিমুগ্ধ লক্ষ্মণ, "হা দেবি, হা আর্য্যে! সেবক লক্ষ্মণ থাকিতে আপনার কিসের আশঙ্কা? লক্ষ্মণ

কখনই লোকাপবাদ ভয়ে আপনার প্রতি মমতাশূন্য হইতে সক্ষম নয়।" বলিয়া সীতার সন্নিধানে আগমন করিলেন। এদিকে কুশীলব, মাতাকে নিরতিশয় উন্মনাঃ দেখিয়া, ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে করিতে জননীর সমীপে উপস্থিত হইল। অন্য দিক্ হইতে কৌশল্যা দেবী, "হা লক্ষ্মী, হা স্বর্ণ-প্রতিমে! তোমার এ দুঃখ-দুর্দ্দশা কে প্রাণ ধারণ করিয়া সহ্য করিতে পারে? আইস গৃহ-লক্ষ্মি! তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া পুর-মধ্যে লইয়া আসি।" বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি, "হা বৎসে! ভয় কি? কাতরা হইও না। রাম সহ তোমার নিশ্চয়ই মিলন ঘটিবে।" বলিয়া পতনোন্মুখী সীতার সমীপে আগমন করিলেন। সীতা সম্পূর্ণ সতী ও পতি-পরায়ণা বলিয়া সভাস্থ সকলেই মত ব্যক্ত করিলেন এবং, তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া, নিরতিশয় শোক প্রকাশ ও অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায় সকলের সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! কালের কঠোর বাসনা প্রবল হইয়া, সকলের সকল সাধে বাদ সাধিল। আত্মীয়গণ নিকটস্থ হইয়াই দেখিলেন যে, জন্ম-দুঃখিনী জানকীর তাপিত জীবন দেহাশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়াছে। অভাগিনী সীতার জীবন-লীলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আর সে দেহ-পিঞ্জরে সে পক্ষিণী ফিরিবে না। আর রামের বিরহ-বেদনায় সে দেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না। আর সে নয়ন নিরন্তর অশ্রু-জলে পরিপূর্ণ থাকিবে না। আর সে রসনা প্রতি-নিয়ত রাম-নামোচ্চারণ করিয়া নৃত্য করিবে না। নিন্দুকের কটু-ভাষা, সন্দেহের তীব্র-জ্বালা, প্রেমাস্পদের অনাদর, আত্মীয়

জনের বিরাগ-ব্যথা, কিছুতেই আর তাঁহাকে বিচলিত হইতে হইবে না। সংসারের সুখ ও সন্তোষ, বা দুঃখ ও অন্তর্দাহ কিছুতেই আর তাঁহাকে উৎফুল্ল বা বিকল-চিত্ত করিবে না।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র, সীতার সমীপে সমাগত হইয়া, তাঁহার এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র, "জানকি, জানকি! এ অধম রামকে ফেলিয়া তুমি কোথায় যাও" বলিয়া সেই সংজ্ঞা-বিহীনা জানকীর চরণ-মূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন চারিদিকে অতি উচ্চ রোলে ক্রন্দন-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। কুশীলব, অতিশয় শোকাকুল হইয়া, বিগত-প্রাণা জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ, রোদন করিতে লাগিল এবং কৌশল্যাদি মহিলা-মণ্ডলী হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে গগন-মণ্ডল পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিশ্চেষ্ট জড়বৎ ভাবে, সন্নিহিত স্তম্ভ-বিশেষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিলেন এবং, সংজ্ঞাহীনের ন্যায়, উদ্দেশ্য-শূন্য দৃষ্টিতে, সম্মুখস্থ পরলোকগতা সীতার দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। এদিকে রোরুদ্যমান ভরত ও শত্রুঘ্ন, বিহিত বিধানে শুশ্রূষা করিয়া, রামের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যে, রামের চৈতন্য পুনরাগত হইলে, তিনি সীতার দেহ-লতা বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"হা প্রিয়ে! এই যে তোমার অনুগত রাম তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে; তথাপি তুমি কথা কহিতেছ না কেন? হা মধুর-ভাষিণি! মধুর বাক্যে এ অভাগা রামের অন্তর-তাপ নিবারণ কর! হা মৃগ-লোচনে! একবার তোমার অনুগত রামের প্রতি দৃষ্টিপাত

কর। হা সীতে! হা করুণাময়ি! হা রাম-হৃদয়-বল্লভে, চিরদুঃখী রামের অপরিসীম দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া, তাহার প্রতি এতাদৃশ নিষ্করুণ ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়। নিদারুণ বজ্র রামের হৃদয়ে পাতিত কর, রাম তাহা নীরবে সহ্য করিবে; গরলোদ্গারী কাল ভুজঙ্গম আনিয়া রামকে দংশন করিতে দেও, রাম সানন্দে তাহার বদন চুম্বন করিবে; তীক্ষ্ণাগ্র শত শত রণায়ুধ প্রয়োগে রামের দেহ বিদীর্ণ কর, রাম তাহাতে সম্পূর্ণরূপ অকাতর থাকিবে; কিন্তু জীবিত-সর্ব্বস্বে! তোমার বিয়োগ-ব্যথা রাম মুহূর্ত্ত-মাত্রও সহ্য করিতে পারিবে না। হা সীতে! হা প্রিয়বাদিনি! হা দুঃখ-সঙ্গিনি! হা নর্ম্ম-সখি! হা লোচনানন্দ-দায়িনি! কোথা যাও? তোমার এ চিরানুগত রামকে ফেলিয়া কোথা যাও?" বলিতে বলিতে রামচন্দ্র আবার সংজ্ঞা-শূন্য হইলেন।

এদিকে কুশ, আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে করিতে, বলিতে লাগিল,—"মা! তোমার এ কি হইল? মা! কেন তুমি এমন করিয়া আছ? উঠ মা! দেখ মা! ভুবন-বিখ্যাত মহারাজ রামচন্দ্র তোমাকে কতই আদর করিতেছেন, দেখ। তোমার কুশীলব কাতর ভাবে কতই রোদন করিতেছে, বারেক তুমি নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাদের প্রতি নেত্রপাত কর। মা! মা! উঠ মা! আমাদের ক্রোড়ে লও মা! আমাদের যে আর কেহ নাই মা! তুমি না থাকিলে, আর কে আমাদের ক্ষুধায় খাইতে দিবে, কে আমাদের বিপদে রক্ষা করিবে, কে আমাদের নৃত্য দেখিয়া আহ্লাদ করিবে, কে আমাদের গান শুনিয়া আনন্দ করিবে, কে আমাদের ক্রোড়ে লইয়া মুখ মুছাইয়া দিবে, কে আমাদের বনফুলের মালা দিয়া সাজাইয়া

দিবে? মা—মা! তোমার কুশ তোমাকে কতই ডাকিতেছে, তোমার লব তোমার জন্য ধূলায় পড়িয়া কতই কাঁদিতেছে। মা—মা—উঠ মা! তুমি চির দিন দয়াময়ী; আজি আমরা কাতর ভাবে এতই ডাকিতেছি তথাপি তুমি কথা কহিতেছ না কেন মা? আমরা কাঁদিলে তুমি যে অস্থির হইতে মা, আমরা ডাকিলে তুমি যে ধাইয়া আসিতে মা। আজি মা! আমরা নিঃসহায় দুটী ভাই মাটীতে লুঠাইয়া এত করিয়া কাঁদিতেছি, তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন মা? মা! মা! উঠ মা! আমাদের কোলে লও মা!"

কৌশল্যা দেবী, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে, বলিতে লাগিলেন,—"হা সীতে, হা রঘু-কুল-রাজ-লক্ষ্মি! কোথা যাও? আমরা জীবিত থাকিতে তোমার জীবন-ত্যাগ. কখনই শোভা পায় না। উঠ বৎসে! তোমার অভাবে আমার এই সোণার সংসার ছাই হইয়া যাইবে। তোমার সমস্ত কর্ত্তব্যই এখনও অসমাপিত রহিয়াছে—তুমি অসময়ে আমাদের বক্ষে এ দারুণ শেলাঘাত করিও না। উঠ মা, কথা কও মা, আমার ক্রোড়ে আইস মা!"

এদিকে রামচন্দ্র পুনরায়, সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"একি! আমার স্বর্ণ-লতিকা সীতা ধূলায় পড়িয়া কেন? হা সীতে, আমাদের অপরিসীম সৌহার্দ্দের সম্প্রতি কি এই পরিণাম? উঠ দেবি! তুমি সম্রাজ্ঞী! এ ধূলি-শয্যা তোমার শোভা পায় না। আইস, আমি তোমাকে বক্ষে করিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে লইয়া যাই। আমার অত্যাচার স্মরণ করিয়া, তুমি কি অভিমানিনী হইয়াছ? চল দেবি! রাম আজীবন তোমার মনোরঞ্জন করিয়া তোমার প্রীতি-লাভের চেষ্টা করিবে। কথা কও—উঠ রাজ-

লক্ষ্মি! হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি আর সীতা সহ সম্মিলন সুখ সমুপস্থিত হইবে না? হা সতি! যদি নিতান্তই এ পুরে বাস করিতে তোমার বাসনা না হয়, তাহা হইলে তুমি অধুনা যে রাজ্যে প্রয়াণ করিতেছ, এই মর্ম্মাহত ও বিধ্বস্ত-হৃদয় রামকেও তথায় সঙ্গে লইয়া যাও। সরলে! শান্তি-স্বরূপে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন্মৃত্যুর ব্যবস্থা করিও না।"

তদনন্তর, চতুর্দ্দিকে কাতর ভাবে নেত্রপাত করিতে করিতে, লক্ষ্মণের সেই নিশ্চল মূর্ত্তি নয়ন-পথে নিপতিত হওয়ায়, রামচন্দ্র কহিলেন—"ভাইরে লক্ষ্মণ! আজি তোর অগ্রজের সর্ব্বস্বান্ত ও জীবনান্ত হইয়াছে। আজি আমাদের অরণ্য-বাস-সঙ্গিনী সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। আজি স্নেহময়ী সীতা আমাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত, পরিত্যাগ করিয়াছেন। রামচন্দ্র, বসনে বদনাবৃত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে লক্ষ্মণের মনে বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব বিষয়ক বোধ জন্মিল এবং তাঁহার নিরুদ্ধ শোক-প্রবাহ সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি, উন্মত্তভাবে রামসমীপে আগমন করিয়া, উভয় হস্তে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ, বলিতে লাগিলেন,—'হে আর্য্য! হে অগ্রজ! হে রঘুনাথ! সত্যই কি আর্য্যা জনক-নন্দিনী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? সত্যই কি এতদিনের পর রঘু-কুল-রাজলক্ষ্মী জগৎ অন্ধকার করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন? সত্যই কি আমাদের কাতর মস্তকে এই অশনি-সম্পাত সঙ্ঘটিত হইয়াছে? হা আর্য্যে! হা অম্বে! হা লক্ষ্মণ-সেবিতে! কোথায় তুমি? আমাদের ছাড়িয়া, তুমি কোথায় যাও? দেবি! বারেক ফিরিয়া আইস, বারেক তোমার বৎসল সেবকের নিবেদন শুনিয়া যাও।

হা মাতঃ! এ লক্ষ্মণের মায়া তুমি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিলে? সুদীর্ঘ বনবাসে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি নিরন্তর তোমার সেবা করিয়াছে; তোমার অদর্শনে, বনে বনে বাতুলের ন্যায়, যে ব্যক্তি কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে; যে ব্যক্তি তোমার জন্য উন্মত্ত হইয়া, বারংবার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে এবং, বহুকালব্যাপক সমর-রঙ্গে প্রমত্ত হইয়া, যে ব্যক্তি তোমার উদ্ধার সাধন করিয়াছে; সেই লক্ষ্মণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া, দেবি, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

তদনন্তর লক্ষ্মণ ভূপতিতা সীতার চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হা মাতঃ! ফিরিয়া দেখ, নয়ন উন্মীলন কর, তোমার বাৎসল্যাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণ আজি মরণোপম যাতনা ভোগ করিতেছে! হায়! এই বজ্র বক্ষে পড়িবে বলিয়াই কি, তখন শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করিয়াও, জীবন লাভ করিয়াছিলাম? এই দারুণ ক্লেশ-পাশ ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই, কি তখন নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম; এই যম-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই, কি তৎকালে বারংবার যম-দ্বার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়ছিলাম? হা আর্য্য রামচন্দ্র! কেন তখন এ অভাগা লক্ষ্মণকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে? হা অঞ্জনা-নন্দন সুহৃদুত্তম! কেন তুমি তৎকালে, বিশল্যকরণীর সাহায্যে, এ অভাগা লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলে? হে মিত্র-মণ্ডলি! কেন তোমরা লক্ষ্মণের তাৎকালিক মোহকে, সুখময় চিরমোহে পরিণত হইতে না দিয়া, তাহার চিরবৈরিতা সাধন করিয়াছিলে?"

তখন লক্ষ্মণ, সীতার চরণ ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"কোন্ মূঢ়

আজি আর্য্যা জনক-নন্দিনীর এ অবস্থা করিল? কাহার প্রকোপে আজি পূজ্যতমা জানকীর এ দশা ঘটিয়াছে? আমি দেখিব সে কীদৃশ পরাক্রান্ত বীর! অমিত-প্রতাপ লঙ্কেশ্বর এই জানকীকে সমুদ্র-পারে লইয়া গিয়াছিল। আমি সেই দুরাচারকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া, সেই দুর্গম প্রদেশ হইতে, সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। আর আজি আমি সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে, যে দুরাচার সীতাদেবীর প্রাণ-হরণ করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া লক্ষ্মণের হস্ত কদাচ নিরস্ত থাকিতে পারে না। মিত্র বিভীষণ! আমাকে ধনুর্ব্বাণ প্রদান কর, আমি দেখিব সীতার প্রাণহন্তা কীদৃশ বলবান্!

তদনন্তর শোকোন্মত্ত লক্ষ্মণ স্থির হইয়া কহিলেন,—"না না! কে বলে সীতার জীবন নাই? এই যে রাম-সীতা আমার সম্মুখে। এই যে রাম-সীতা আমার হৃদয়ে। আন শত্রুঘ্ন! ভ্রাতঃ! শীঘ্র ছত্র আনিয়া দেও, আমি রাম-সীতার মস্তকে ছত্র ধারণ করি। কর কি ভরত! চামর বীজন কর ভাই—দেখিতেছ না দেবীর বদনে ঘর্ম্ম-বারি বিগলিত হইতেছে! আহা মা! তোমার এত শোভা!" বলিতে বলিতে শোকোন্মত্ত লক্ষ্মণের সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল এবং, প্রভঞ্জন-পাতিত পাদপের ন্যায়, তাঁহার দেহ ভূতলে নিপতিত হইল।

তখন বিয়োগ-ব্যথিত রামচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সুহৃদ্গণ! ভ্রাতৃগণ! শীঘ্র আমার জীবনের জীবন লক্ষ্মণকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ কর। ভাইরে লক্ষ্মণ! উঠ ভাই। তুমিই রামের জীবন, তুমিই রামের হৃদয়, তুমিই রামের সর্ব্বস্ব। হা সীতে! হা নিষ্করুণে! একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, একবার ফিরিয়া আসিয়া তোমার কুকীর্ত্তি দর্শন করিয়া যাও।

দেখ পাষাণি! তোমার শোকে আমার জীবনের সাররত্ন বুঝি আজি আমাকে ছাড়িয়া যায়। অহো লক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! তুমি কি মনে করিয়াছ, পাষাণ রাম তোমার বিয়োগ-ব্যথাও সহিয়া থাকিবে? হা ভ্রাতঃ! হা লক্ষ্মণ!" শোকাতুর রামচন্দ্র পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

এইরূপে সেই নৈমিষারণ্যস্থ যজ্ঞক্ষেত্র তৎকালে শোক-স্রোতে প্লাবিত হইয়া উঠিল। সংসার-ত্যাগী, মায়া-মোহাদি পরিশূন্য ঋষি-তপস্বীগণও এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া অশ্রু-বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাসে দিগ্বলয় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। আত্ম-পর সকলেই নির-তিশয় শোকাতুর হইলেন।

এদিকে বশিষ্ঠাদি হিতৈষিগণের পরামর্শ-ক্রমে, ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতাদেবীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জন্ম-দুঃখিনী জানকীর জীবনাবসান হইল। তাঁহার ন্যায় পতি-পরায়ণা, মধুর-স্বভাবা, সর্ব্ব-সদ্গুণালঙ্কৃতা রমণী বোধ করি ভূ-মণ্ডলে আর কখন জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। সুখ-সংবিধায়ক সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াও, তাঁহার ন্যায় নিরন্তর ক্লেশ-ভারে নিপীড়িতা, বোধ করি, ইহ জগতে আর কোন নারীকেই হইতে হয় নাই। যিনি রাজর্ষি জনকের তনয়া, ভুবন-বিখ্যাত রঘু-বংশের যিনি কুল-বধূ, অলৌকিক-গুণ-সম্পন্ন রামচন্দ্র যাঁহার স্বামী, ভক্তিময় বীরবর লক্ষ্মণ যাঁহার দেবর, তাঁহাকে যাবজ্জীবন কেবল যাতনানলে বিদগ্ধ হইতে হইয়াছে, ইহা মনে করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়। এই জন্যই অদ্যাপি ভারত-বাসী জনগণ, বিষাদ-মিশ্রিত ভক্তির সহিত,

তাঁহার নাম স্মরণ করে এবং আপনাদের কন্যার সীতা নামকরণ করিতে সভয়ে সঙ্কুচিত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাল সহকারে আত্মীয় জনের হৃদয় হইতে, সীতার মরণজনিত শোকের নবীনতা অপচিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে অসহনীয় যন্ত্রণার কঠোরতা অণুমাত্রও মন্দীভূত হইল না। গাম্ভীর্য্যের অবতার-স্বরূপ, ধৈর্য্যের গিরি-কল্প, মহারাজ রামচন্দ্র হস্তন্যস্ত গুরু কর্ত্তব্য-পালনে নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু এই ঘোরতর বিপৎপাতের পর হইতে, তিনি বিষাদের সজীব প্রতিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় দুঃসহ দুঃখ-ভারে প্রতিনিয়ত বিমর্দ্দিত হইতে থাকিল—কাল তাহা প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। তাঁহার প্রাণ শুষ্ক ও, মরুভূমি-তুল্য, অসার হইয়া গেল—কাল তাহা সুস্থ করিতে পারিল না। তাঁহার অন্তর নিরন্তর দুঃখ-দাহনে বিদগ্ধ হইতে লাগিল—কাল তাহা প্রশমিত করিতে পারিল না। যে উৎকট শোকোৎপীড়নে তাঁহার জীবন ছিন্ন ভিন্ন ও মথিত হইয়া গেল, তাহা প্রকৃতিস্থ করা কালের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই সুপ্রতিষ্ঠ রাজ-পরিবার-ভুক্ত তাবৎ ব্যক্তির বদনমণ্ডল এই বিষম দুর্ঘটনার পর হইতে, দারুণ বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। উৎসাহ ও আনন্দ, সুখ ও সন্তোষ, সেই ঘটনার পর হইতে, রঘু-রাজ-পুরী হইতে পলায়ন করিল।

এই দারুণ দুঃসময়ে কুশীলবকে লাভ করিয়া, রাম ও তাঁহার স্বজনগণ আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন তাহাদিকে বিনোদিত করা, তাহাদের হৃদয় হইতে

দুরন্ত মাতৃশোক অপনোদিত করা, সকলেরই প্রধান চেষ্টা হইল। বালকদ্বয় রাজকুমারোচিত বসন-ভূষণ পরিধান করিতে আরম্ভ করিল; রাজভোগ আহার করিতে অভ্যাস করিল এবং, আপনাদিগকে মহাযশা রামচন্দ্রের আত্মজ জানিয়া, সুখী হইল।

কোন প্রকারে, আরব্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, মহারাজ রামচন্দ্র, আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুগণ সহ, অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং, যথাসাধ্য যত্ন সহকারে, রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করার কিছুকাল পরে, বৃদ্ধা কৌশল্যা দেবীর শোক-শুষ্কায়মানা জীব-লীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। অনতিকাল মধ্যে সুমিত্রা এবং কেকয়ী দেবীও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। অবসন্ন রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় বিহিত-বিধানে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। এতদিন পরে, পিতৃহীন ভ্রাতৃগণ মাতৃ-স্নেহ-রূপ পরম-ধনে বঞ্চিত হইলেন। যে মাতৃস্নেহ-রূপ সুবিশাল বিটপীর সুশীতল ছায়া-তলে তাঁহারা এত দিন শান্তি-ভোগ করিতেছিলেন, অধুনা তাহার মূলোৎপাটিত হইল। সুখে ও দুঃখে, শোকে ও আনন্দে, দূরে ও নিকটে, সম্পদে ও বিপদে যে পবিত্র মাতৃ-স্নেহ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, তাহা অতঃপর নিঃশেষ হইয়া গেল।

একদিন বিজ্ঞোত্তম রামচন্দ্র, ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন,—“ হে জীবিতাধিক অনুজগণ! এত দিন তোমরা কায়-মনোবাক্যে আমার পরিচর্য্যা, ও রাজকার্য্যে আমার সাহায্য, করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলে।

কিন্তু, তোমরা কদাপি স্বহস্তে রাজ-দণ্ড ধারণ করিয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিলে না। হে স্নেহময় ভ্রাতৃগণ! আমরা যেরূপ অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-সূত্রে বদ্ধ এবং আমাদের একের প্রীতিতে সকলেরই যেরূপ অপরিসীম সন্তোষ, তাহাতে আমাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণের চক্ষে আমরা চারিজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, প্রত্যুত আমরা এক-হৃদয় ও এক-প্রাণ; সুতরাং সম্পূর্ণরূপ অভিন্ন ভাবাপন্ন। কিন্তু প্রেমাস্পদগণ! তোমাদের সকলেরই নয়ন-বিনোদন নন্দন জন্মিয়াছেন এবং সেই রাজ-কুমারেরা, সুশিক্ষা প্রভাবে, রাজকার্য্যে সমীচীন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন এবং সর্ব্ব প্রকার ক্ষত্রিয়োচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়াছেন। কেবল কুশীলব, আজীবন অরণ্য-বাস হেতু, বিষয়-ব্যাপারে তাদৃশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, কুমারগণকে, এই সময় হইতেই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ও অভিষিক্ত করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। কারণ, আমরা জীবিত থাকিতে থাকিতে, কুমারগণ রাজ-দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা নিয়তই তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইব এবং, আবশ্যক স্থলে, সতর্ক করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুদক্ষ করিতে পারিব। শত্রুঘ্ন, লবণকে নিপাতিত করিয়া, পূর্ব্বেই যে সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তত্রত্য দুই বিভিন্ন প্রদেশে, তদীয় নন্দন সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারিবে। ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! অতঃপর

তুমি আর অনর্থক অযোধ্যায় কালহরণ না করিয়া, ত্বরায় নব-বিজিত রাজ্যে গমন কর। যেহেতু নর-পতি-হীন রাজ্য, শীঘ্রই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়।"

শক্রঘ্ন, বিনীত ভাবে মস্তকাবনত করিয়া, সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ রামচন্দ্র আবার বলিতে লাগিলেন,—"এক্ষণে ভরত-নন্দন তক্ষ ও পুষ্কলকে এবং লক্ষ্মণ-নন্দন অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকেও রাজ্যাভিষিক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব ভ্রাতৃগণ! আমার এই বাসনা ফলবতী করিবার নিমিত্ত মনোযোগ প্রদান কর।"

অনুজগণ অগ্রেজর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তদীয় আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যে, ধন-ধান্য পরিপূর্ণ, নগ-কানন-শোভিত, এক মনোহর রাজ্যে, তক্ষশিলা ও পুষ্কল নামে দুই সুসমৃদ্ধ রাজধানী সংস্থাপন করিয়া, ভরত-তনয়দ্বয়কে, বিহিত-বিধানে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তদনন্তর স্বাস্থ্য-সুখ-সম্পন্ন, সুদৃশ্য কারুপথ দেশে, আঙ্গদীয়া নামে এক পরম রমণীয় নগর সংস্থাপিত হইল এবং, নদ-নদী-তড়াগ-শোভিত শস্যশালী, মল্লভূমি প্রদেশে চন্দ্রকান্ত নামে এক নগর বিনির্ম্মিত হইল। লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়, সবিশেষ সমারোহ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান-সহকারে, এই দুই নব সন্নিবিষ্ট রাজধানীস্থ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কেবল কুশ ও লব, শিক্ষার অপূর্ণতা হেতু, সম্প্রতি কোন রাজ্য-বিশেষের সিংহাসনাধিকারী হইলেন না। তাঁহারা রাজ-সভায় থাকিয়া, সচিবগণ সহ, রাজনীতির সম্যক্ আলোচনায় নিযুক্ত রহিলেন।

এই রূপে ভ্রাতু-কুমার-গণকে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত

করিয়া, ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কর্ত্তব্য-পালন ও বিহিত-বিধানে প্রজা-রঞ্জন করিতে করিতে, শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহ কোন প্রকারে ধীরভাবে, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যখনই রামচন্দ্র কার্য্য-ভার হইতে অবসর লাভ করিতেন, তখনই সৌভ্রাত্রের এই অত্যদ্ভুত এবং অতুলনীয় দৃষ্টান্ত-স্থলীভূত ভ্রাতৃচতুষ্টয়, নিভৃত কক্ষে সম্মিলিত হইয়া, ধর্ম্ম-চর্চ্চায় ও প্রিয়-প্রসঙ্গালাপে কালাতিবাহিত করিতেন।

শত্রুঘ্নকে প্রায়ই মধুরাপুরীতে অবস্থান করিতে হইত এবং ভরতকে, নানাবিধ বৈষয়িক প্রয়োজনানুরোধে, সতত ব্যাপৃত থাকিতে হইত; এজন্য তাঁহারা, সর্ব্বক্ষণ রাম-সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহাকে বিনোদিত করিবার সুযোগ পাইতেন না। কিন্তু অনন্য-কর্ম্মা লক্ষ্মণ, সংসারের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া, সর্ব্ববিধ প্রয়োজনানুরোধ উপেক্ষা করিয়া, নিরন্তর রাম-সন্নিধানে অবস্থান ও রাম-রঞ্জন করাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। রামের সেই অরণ্য-বাস-সহচর, কুটীর-দ্বারের নিদ্রাহীন প্রহরী, বিপদ্-কালের রক্ষক, শক্তি-শেলাহত, মেঘনাদ-হন্তা, প্রিয়ানুজ আজন্ম প্রতিনিয়ত রামের পরিচর্য্যা করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, সংসারের কোন ভোগ-সম্ভোগই তাঁহার তাদৃশ সন্তোষ সমুৎপাদনে সক্ষম হইত না। রামার্পিত-প্রাণ লক্ষ্মণ রামের

প্রিয়কার্য্য সাধনই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

একদা রাম ও লক্ষ্মণ, একান্তে উপবিষ্ট হইয়া, আপনাদের অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে করিতে, কখন বা শোকাবেগে অভিভূত হইতেছিলেন, কখন বা হর্ষ-ভরে পুলকিত হইতেছিলেন। বিগত ঘটনাপুঞ্জ সমালোচন করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন,—"আর্য্য! অতীত আলোচনায় অপরিসীম বিষাদ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতেছি না। দেখিতেছি, আর্য্যের এই নিষ্পাপ জীবন-তরণী নিরন্তর নির্ব্বেদ-নীর-নিধি অতিক্রম করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। সততার আদর্শ, কর্ত্তব্য-পরায়ণগণের শীর্ষ-স্থানীয়, ভূপতি-বৃন্দের শিক্ষা-স্থলীভূত, বিপুল বল-বিক্রম-সম্পন্ন মহারাজ রামচন্দ্রকে চিরদিনই যাতনানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছে, একথা স্মরণ ও চিন্তন করা যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার বিষয়। আর্য্যের যৌব-রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে অযোধ্যা রাজ্য উৎসবপূর্ণ ও নর-নারী-গণ আনন্দ-বিহ্বল, সহসা বিধাতৃ-বিড়ম্বনায়, আর্য্যের চতুর্দ্দশ বৎসর-ব্যাপী বন-বাসের ব্যবস্থা হইল। কষ্টের সেই সূত্র-পাত হইল এবং সেই সূত্রাবলম্বনে এ পর্য্যন্ত অপরিসীম যাতনা-পরম্পরা ভবদীয় জীবনের অপরিহার্য্য সহচর হইয়া রহিয়াছে। সেই ঘোরারণ্যে শত্রুর আবির্ভাব ও সমরোৎপত্তি, রাবণ কর্ত্তৃক জানকী-হরণ, আর্য্যার নিমিত্ত বনে বনে সরোদনে অন্বেষণ, দুস্তর সাগর অতিক্রম, অমিত পরাক্রম বহুজন-শালী রাবণের সহিত সুদীর্ঘ বিষম সমর, অযোধ্যায় পুনরাগমনের পর নিদারুণ লোকাপবাদ শ্রবণ, সততার আদর্শ স্বরূপা অন্তর্ব্বত্নী জানকীর নির্ব্বাসন, বহুকাল-ব্যাপী দুর্ব্বিষহ বিরহ-বেদনার পর, পুনরায় সহসা সেই দেবীর সন্দর্শন-লাভ,

তদনন্তর অসহনীয় মনস্তাপের প্রাবল্যে, সেই দেবীর দেহ-ত্যাগ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই নিয়ত স্মৃতি-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। এরূপ অসামান্য ক্লেশ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া, আর্য্যের সুমহৎ জীবন নিরন্তর নিরতিশয় অপ্রসন্ন রহিয়াছে, এবং উত্তোরোত্তর অধিকতর অবসন্ন হইতেছে, ইহা আমি সততই লক্ষ্য করিতেছি। এই গুরু-বিষাদ-ভারাবনত অন্তরের অনুমাত্র বিনোদনে সক্ষম হইতেছি না বলিয়া, সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও, এই যাতনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রসাদনে সমর্থ হইতেছি না দেখিয়া, আর্য্যের এই অধীন সেবক সতত আত্ম-জীবনকে ধিক্কার প্রদান করে এবং, আর্য্যের এই বিষাদ-কালিমাবৃত মুখ-মণ্ডল নিয়ত নিরীক্ষণ করা অপেক্ষা, জীবন ত্যাগ করিয়া এ যাতনার সমাপ্তি করা শ্রেয়ঃ বলিয়া সে সর্ব্বদাই আলোচনা করে। হা বিধাতঃ! অবিশ্রান্ত অসহ্য যাতনানলে দগ্ধ করিবে বলিয়াই কি এ হতভাগ্য লক্ষ্মণের সৃষ্টি করিয়াছিলে? যদি আর্য্যের চিত্ত-প্রসন্নতা সাধিত করা এ অক্ষম অভাগা লক্ষ্মণের সাধ্যায়ত্ত না হয়, তবে হে ভগবন্! তাহার জীবনের আর প্রয়োজন কি আছে? এ অবস্থায় মরণই তাহার একমাত্র প্রার্থয়িতব্য। কৃপা করিয়া, হে বিধাতঃ! অকর্ম্মণ্য লক্ষ্মণের মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া দেও।” এই বলিয়া ভ্রাতৃ-প্রেম-পরায়ণ লক্ষ্মণ অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য আকর্ণন করিয়া ও তদীয় লোচনে অশ্রু-ধারা দেখিয়া, লক্ষ্মণ-গত-প্রাণ রামের হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং তিনি সকাতরে বলিলেন,—“বৎস লক্ষ্মণ! মনুষ্য-জীবন সুখ-দুঃখের সমষ্টি। নিরবচ্ছিন্ন সুখ, বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোন মনুষ্যকে কখনই ভোগ করিতে হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা

হইলে বস্তুতই মানব-জীবন যৎপরোনাস্তি ভারভূত হইত। আমাদের জীবনোদ্যানও সুখ-স্বর্ণ-লতিকায় ও দুঃখ-কণ্টকী-লতায় আকীর্ণ। নানারূপ অসহনীয় যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিতে করিতেও, আমি অপরিসীম সুখের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকি এবং সেই সুখই আমাকে এ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। যে বিধাতা কৃপা করিয়া এ দীন-হীন রামের পার্শ্বে, নিত্যসহচর রূপে, প্রেমময় লক্ষ্মণকে সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার করুণা নিশ্চয়ই অপরিমেয়। সুখে বা দুঃখে, বনে বা রাজ-প্রাসাদে, লক্ষ্মণ রামের নিত্য সঙ্গী এবং লক্ষ্মণই রামের জীবন। রামের ছায়াস্বরূপ, জীবনাধিক লক্ষ্মণ, দারুণ বিষাদ-সাগর মগ্ন রাম-হৃদয়ে, নিয়তই আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে এবং লক্ষ্মণ-প্রেমই রামকে অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। হে ভগবন্! তুমি এ রামের প্রতি অপরিসীম কৃপাবান্। জগতে আর কাহাকে তুমি এরূপ অতুলনীয় ভ্রাতৃ-রত্ন প্রদান করিয়া সৌভাগ্যশালী করিয়াছ? তোমার এই অত্যদ্ভুত কৃপার নিমিত্ত, রাম তোমার চরণে চির-কৃতজ্ঞ। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার নয়ন-তারা, তুমিই আমার প্রাণ। তুমি সন্নিকটে থাকিলে, রাম কোন বিপদ-কেই বিপদ মনে করে না এবং কোনরূপ দুঃখই রামকে অবসন্ন করিতে পারে না। এই ভাগ্যবান লক্ষ্মণাগ্রজ জীবনাগত যাবতীয় যাতনাই অকাতরে সহ্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। লক্ষ্মণ-রূপ স্পর্শ-মণি-সংস্পর্শে রাম-হৃদয়স্থ বিষাদ-লৌহও স্বর্ণ-কান্তি পরিগ্রহ করিয়া সহনীয় হইয়া থাকে। সীতা যে চিরদিনের নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও নীরবে সহ্য করিতেছি, কিন্তু প্রাণাধিক লক্ষ্মণ! তুমি যদি কিয়ৎ-

কালের নিমিত্তও নয়নান্তরালে অবস্থিতি কর, তাহাও আমি সহ্য করিতে অক্ষম। না ভাই, লক্ষ্মণ যাহার অনুজ, সে রাম কখনই অভাগা নহে।" এই বলিয়া সেই ভ্রাতৃ-প্রেম-মুগ্ধ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমীপস্থ হইলেন এবং সস্নেহে তাঁহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ ও তাঁহার বদন হইতে নেত্র-নীর বিমুক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় প্রতীহারী তথায় প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল যে, একজন বিভূতি-বিলেপিত-কায়, জটা-ভার-সমন্বিত, ক্ষীণ-বপুঃ তপস্বী রাজ-দর্শনার্থ দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। কর্ত্তব্য-পরায়ণ রামচন্দ্র, তখনই লক্ষ্মণের বদন হইতে হস্তোত্তোলন করিয়া, ত্বরায় সেই তপস্বীকে সসম্ভ্রমে সেই স্থানে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অনতিকাল মধ্যে প্রতিহারী সহ এক জটা-কলাপ-বিভূষিতাঙ্গ, কৃশ-কায়, ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর, তেজস্বী তপস্বী রামচন্দ্রের সেই বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিহিত-বিধানে তাঁহার সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই তেজঃ-প্রতাপান্বিত তপোধন আসনে সমুপবিষ্ট হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তখন সেই মনস্বী তপস্বী গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"হে রাজাধিরাজ রামচন্দ্র! আমি অতি গুরু-প্রয়োজনানুরোধে ভবৎ-সমীপে আগমন করিয়াছি। আপনি একান্তে অবস্থিত হইয়া, আমার বক্তব্যে কর্ণপাত করিয়া, আমার বাসনা সফল করুন।"

ধর্ম্মানুরাগী রামচন্দ্র কহিলেন,—"তপোধন! ভগবৎ-কৃপায় ভবদীয় গুরু প্রয়োজন এ অধম জনের দ্বারা সফলিত হইলে, আমি অপনাকে নিরতিশয় ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিব। এক্ষণে এ অনুগত রাম কোন্ কার্য্য সাধন করিয়া আপনার প্রসাদ লাভের প্রয়াসী হইবে তাহা আজ্ঞা করুন।"

তখন সেই তপস্বী বলিতে লাগিলেন,—"হে রঘু-কুল-ধুরন্ধর! আমার প্রয়োজন আপনি ব্যতীত অন্য কাহারও

নিকটে বক্তব্য নহে। অতএব নৈসর্গিক অনুকম্পা বশে, আপনি, একান্তে আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবার ব্যবস্থা করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন।"

তপোধনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রামচন্দ্র, দূরস্থিত প্রতীহারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলে, সে বিনয়-নম্র অভিবাদন করিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। তখন রামচন্দ্র সেই যোগীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন,—"হে মহাত্মন্! আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিয়া এ দাস চরিতার্থতা লাভ করিবে এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করুন।"

তপস্বী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন,—"আমার বক্তব্য কেবল আপনারই কর্ণোদ্দেশে লক্ষিত। অতএব এস্থলে অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিত না থাকাই আবশ্যক।"

রামচন্দ্র চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"হে তপোধন! এ কক্ষে লক্ষ্মণের অবস্থিতিও কি আপনার অননুমোদিত? লক্ষ্মণ রামের জীবন, লক্ষ্মণ রামের ছায়া, রাম লক্ষ্মণময়। যাহা রামের জ্ঞাতব্য, তাহা লক্ষ্মণেরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য। রাম লক্ষ্মণ অভিন্ন-ভাবাপন্ন। সেই লক্ষ্মণের অবস্থিতিও আপনার উদ্দেশ্যের বিরোধী?"

তপস্বী কহিলেন,—"মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করিবেন; এ গৃহে, আপনি ভিন্ন, আর কাহারও অবস্থান আমার সঙ্কল্পানুকুল নহে। কেবল তাহাই নহে, মহারাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, যাবৎকাল আমি ভবৎ-সমীপে উপস্থিত থাকিয়া বাক্যালাপ করিব, তাবৎকালের মধ্যে, যদি কোন

ব্যক্তি এ কক্ষে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে আপনি চিরদিনের নিমিত্ত বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইবেন।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“হে তাপস-শ্রেষ্ঠ! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়, কি জানি কেন, নিতান্ত ভয়-বিহ্বল হইতেছে। যোগানুরত পুণ্য-পুরুষ সাধু-বৃন্দের সন্তোষ-সাধন আমি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি। হে প্রভো! আমি সেই প্রিয়কর্ত্তব্য পরিপালনার্থ কোন প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইতে কদাপি সঙ্কুচিত হইব না। কিন্তু হে তপোধন! ভবদীয় আদেশ শ্রবণে, আজি আমার হৃদয় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; নানাবিধ আশঙ্কায় আমার অন্তর অভিভূত হইতেছে; নানা বিপদের বিভীষিকাময়ী ছায়া আমার কল্পনা-নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু যাহাই হউক, আমি কদাপি তাপসাজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।”

তদনন্তর লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“ভ্রাতঃ! অবশ্যই এ তাপসোত্তমের প্রয়োজন অসাধারণ হইবে। এরূপ বিসদৃশ প্রতিজ্ঞায় ইহ জীবনে আমাকে আর কদাপি বদ্ধ হইতে হয় নাই। হৃদয় কেন কম্পিত হইতেছে? কি জানি আমার অদৃষ্টে কি আছে! কিন্তু যাহাই হউক, এই তেজঃ-পুঞ্জ তপোধনের প্রস্তাবিত পণ নিতান্ত ভীতি-প্রদ হইলেও, আমি অঙ্গী-কারবদ্ধ হইতে বিমুখ হইব না এবং, কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া, কখনই ত্বদীয় অপ্রসন্নতা সঞ্চয় করিব না। বিধাতঃ! এই পবিত্র-চেতা তপোধনের আজ্ঞা-পালনে রাম যেন অক্ষম না হয় এবং রাম যেন কোন ক্রমেই তাঁহার অণুমাত্র অপ্রীতির কারণ না হয়। ভাই লক্ষ্মণ! এই মহাপুরুষের কথিত পণ অতি কঠিন,

কার্য্য অবশ্যই অতি ভয়ানক এবং মৎকৃত প্রতিজ্ঞাও অতি কঠোর। তোমার সহায়তা ভিন্ন যে রাম, কোন কার্য্যই সাধন করিতে অক্ষম, অদ্য এই অতি দুষ্কর কার্য্য-সাধনে তোমার সাহায্য তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। অতএব যাও ভাই, তুমি স্বয়ং দ্বারে প্রহরীরূপে অবস্থান কর। সাবধান! কেহই যেন এই তপোধনের অবস্থিতি-কাল-মধ্যে আমার নিকটস্থ না হয়। আর তোমাকে কি বলিব? মনে থাকে যেন, রাম সত্যবদ্ধ—সত্যানুরোধে রাম জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কদাপি কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহে।"

তখন লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে নিবেদন করিলেন,—"ভবদীয় আজ্ঞা-পালনে লক্ষ্মণের জীবন চিরাকাঙ্ক্ষী। আমি স্বয়ং দ্বারে প্রহরীরূপে অবস্থিতি করিব, এবং কাহাকেও কোন ক্রমেই ভবৎ-সকাশে আগমন করিতে দিব না। অহো! লক্ষ্মণের আজি একি অতুলনীয় সৌভাগ্য! অরণ্য-বাস কালে আর্য্যা-সহ আপনি কুটীরে অবস্থিত হইলে, এই অধম সেবক আপনা-দের দ্বার রক্ষা করিত। সে প্রিয় কার্য্য বহুদিন আর সম্পন্ন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। আজি ভাগ্য-বলে লক্ষ্মণকে পুনরায় সেই প্রিয় কার্য্যে ব্রতী হইতে হইতেছে। কিন্তু হায়! আজি কোথায় সে সীতাদেবী! হা লক্ষ্মণ! আজি তুমি অপূর্ণ কার্য্য সাধনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছ। হউক, রাম-কার্য্য যেমনই হউক, তাহা সতত প্রীতিপ্রদ।"

ধীরে ধীরে বীরর্ষভ লক্ষ্মণ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং, দ্বার-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, মনে মনে বলিতে লাগি-লেন,—"হে সৌভাগ্যশালী রামানুজ! রঘুনাথের বাঙ্‌নিষ্ঠা ইহ জগতে অতুলনীয়; অতএব সাবধান হইয়া দ্বার রক্ষায়

নিযুক্ত হও। কিন্তু কেন আজি আমার হৃদয় এরূপ অবসন্ন হইতেছে? কেন অকারণেও আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে? রামাজ্ঞা পালন-রূপ প্রিয় কর্ত্তব্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াও, কেন আমার অন্তর ব্যথিত হইতেছে? জানি না, কেন আজি এ সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্মণকে অভিভূত করিতেছে। কিন্তু আশঙ্কাই বা কিসের? রাম-চরণার্পিত-প্রাণ লক্ষ্মণের ইহ-জীবনে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। কারণ রামের অদর্শন ভিন্ন, লক্ষ্মণ আর কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া জ্ঞান করে না। সে রামের সহিত যখন তাহার জীবন-কাল মধ্যে অদর্শনের সম্ভাবনা নাই, তখন লক্ষ্মণ আর কোন্ ভয়ে ভীত হইবে? রাজ্য-পদই বা রসাতলে যাউক, বীর-শক্তিই বা আমার দেহত্যাগ করুক, সংসারের সকল সংসৃষ্ট ব্যক্তিই বা আমার সম্পর্ক অস্বীকার করুক, রঘুনাথের পবিত্র পাদ-পদ্ম আমার নয়ন-সম্মুখে বিরাজিত থাকিলে, আমি কোন দিকে ভ্রুক্ষেপও করি না। অতএব রে লক্ষ্মণ-হৃদয়! ইহ জীবনে তোর ভয়ের কারণ কিছুই নাই।”



একাদশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ, এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে, দ্বার-সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে জ্বলজ্জটা-কলাপ-ধারী, শিরা-যুক্ত-শীর্ণ-কলেবর, ভ্রূ-ভঙ্গ-পরায়ণ, কুটিল-নেত্র মহর্ষি দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণের সম্মুখাগত হইলেন। সেই কোপন-স্বভাব, প্রথিত-নামা, মহাতপা ঋষিকে দর্শনমাত্র, লক্ষ্মণ ভক্তিভাবে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। মুনি-সত্তম, আসন পরিগ্রহ না করিয়া, কহিলেন,—"হে সুমিত্রা-নন্দন! রঘুবংশ-কেতন রামচন্দ্র কোথায়? তাঁহারই নিকট আমার প্রয়োজন আছে। অতএব আমাকে অবিলম্বে রাম-সকাশে লইয়া চল।"

তখন লক্ষ্মণ, গল-লগ্নীকৃত-বাসে, বিনয়-নম্র ভাবে, নিবেদন করিলেন,—"হে ঋষিরাজ! মহারাজ রামচন্দ্র সম্প্রতি, নিতান্ত গোপনীয় প্রয়োজনানুরোধে, এক তপোধনের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। এ সময়ে তাঁহার নিকট কাহারও গমন করিবার অনুমতি নাই। অতএব হে ঋষি-পুঙ্গব! আপনি কৃপা করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম উপভোগ করুন; অচিরকাল মধ্যে মহারাজের সহিত পরামর্শ-নিরত যোগী প্রস্থান করিবেন এবং তখন তিনি ভবদীয় আজ্ঞাধীন হইয়া ধন্য হইবেন।"

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার লোচন-যুগল

প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"রে মূঢ়মতি স্পর্দ্ধিত লক্ষ্মণ! তুই কি মনে করিয়াছিস্, দীন-হীন ভিক্ষুকের ন্যায়, দুর্ব্বাসা রামের অবসর প্রতীক্ষায়, দ্বারে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? রে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট রঘু-কুল-কুলাঙ্গার! তুই কি মনে করিয়াছিস্, এই দুর্ব্বাসা, ইতর জনের ন্যায়, তাচ্ছিল্যের যোগ্য ব্যক্তি? ধিক্ তোর বিবেচনায়! ধিক্ তোর অবমাননাকারী রসনায়! যদি এখনও তোর সদ্বিবেচনা তোকে দুর্ব্বাসার ক্রোধ হইতে অব্যাহতি লাভের পরামর্শ প্রদান করে, যদি এখনও তোর ধর্ম্ম-জ্ঞান এরূপে ঋষি-অবমাননায় বিরত হইতে মন্ত্রণা দেয়, যদি এখনও তুই তোর প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ করিয়া, সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতে বাসনা না করিস্, তাহা হইলে রে উন্মার্গগামী, বিবেক-বিমূঢ় লক্ষ্মণ! আমাকে অবিলম্বে রাম-সমীপে লইয়া চল্।"

ক্রোধোদ্দীপ্ত মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাঁহার সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি মনে করিতে লাগিলেন, 'হায়! এইরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি এতক্ষণ আমার হৃদয় অকারণে উৎকণ্ঠিত হইতেছিল? হা! ভগবন্! অদ্যই কি এ অভাগার জীবলীলা সমাপ্ত করিবে স্থির করিয়াছ? হা প্রভো রামচন্দ্র! এইরূপ কঠিন বিপদে পতিত হইতে হইবে বলিয়াই কি ভবদীয় বদনারবিন্দ হইতে সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা-বাক্য বিনির্গত হইয়াছে? হে অপরিজ্ঞাত ঋষি-রাজ! পূর্ব্ব হইতেই এবংবিধ পরিণাম পরিজ্ঞাত হইয়াই কি আপনি তাদৃশ সর্ব্বনাশ-সাধক পণে রঘুনাথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন? হা লক্ষ্মণ! সত্য-

বদ্ধ ধর্ম্ম-বীর রামচন্দ্র, জীবনান্ত হইলেও, কদাপি সত্যের অপলাপ করিবেন না ; অতএব রে অভাগা লক্ষ্মণ ! অদ্য তোকে নিশ্চয়ই রঘুনাথের পবিত্র পদাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সুতরাং অদ্যই তোর জীবনের শেষ দিন। এখন আর বৃথা চিন্তায় কাল-হরণ করিয়া ফল কি ? যতক্ষণ রামের বদন হইতে বর্জ্জন-বাক্য কর্ণ-গোচর না হইতেছে, যতক্ষণ তোর কাতর দেহে প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত হইতেছে, ততক্ষণ, অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, সেই রঘুনাথের পবিত্র পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে নিযুক্ত থাক্।"

লক্ষ্মণকে চিন্তাকুল দেখিয়া, রোষ-কষায়িত-লোচনে দুর্ব্বাসা কহিতে লাগিলেন,—"রে পাপাধম ! রে ঋষি-অবমাননাকারী ! রে ভ্রষ্ট-বুদ্ধি ! তুই বৃথা কাল-হরণ করিয়া আমাকে অধিক-তর অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছিস্। আমি দেখিব, তোর এই নিদারুণ অবিমৃষ্যকারিতা-নিবন্ধন, পবিত্র রঘু-কুল নির্ম্মূল হয় কি না। এই দেখ দুরাত্মন্ ! ব্যথিত, অপমানিত, ভগ্ন-মনো-রথ দুর্ব্বাসা রঘু-রাজের দ্বার হইতে প্রস্থান করিতেছে। ইহার পরিণাম ফল কিরূপ বিষময় হইবে, যদি তোর অত্যহঙ্কার-গিরির অভ্যন্তর প্রদেশে বিন্দুমাত্র জ্ঞান-রত্নের অবশেষ থাকে, তাহা হইলেও তুই বুঝিয়া স্থির করিতে পারিবি। ইহ জগতে দুর্ব্বাসার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সমক্ষে অবনত-মস্তক না হয় এমন মানবের অস্তিত্বই নাই। রে মূঢ় ! রে বল-গর্ব্বিত নরাধম ! তুই আজি সেই দুর্ব্বাসাকে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ প্রদান করিয়া বিদূরিত করিলি। থাক্ তুই ! অচিরকাল মধ্যে দেখিতে পাইবি, দুর্ব্বাসার রোষাগ্নির শিখা কিরূপে রঘু-বংশকে গ্রাস করে।"

তখন ভীতি-বিকম্পিত-কলেবর লক্ষ্মণ, ঋষিরাজ দুর্ব্বাসাকে প্রতিগমনোন্মুখ দেখিয়া, তাঁহার পাদ-মূলে নিপতিত হইলেন এবং নিরতিশয় কাতরতা সহ বলিলেন,—"হে রঘু-কুল-সহায় ঋষি-রাজ! আজি আপনি আপনার এই চিরাশ্রিত রঘু-কুল-মূলে নিষ্কারুণ্য-রূপ কঠোর কুঠারাঘাত করিবেন না। এ অধম দাসানুদাসকে আপনি অদ্য যে কঠিন কর্ত্তব্য পালনে আদেশ করিতেছেন, তাহা সম্পন্ন করিলেই এ অভাগার জীব-লীলা অব-সিত হইবে। সত্যব্রত, বাণ্ড নিষ্ঠ, রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে, যতক্ষণ তিনি তদীয় বর্ত্তমান নিভৃত নিকেতনে অবস্থান করিয়া, অপরিচিত তপস্বীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন, ততক্ষণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সমীপস্থ হইবে তাহা-কেই তিনি বর্জ্জন করিবেন। অধুনা ভবদীয় আজ্ঞা পরি-পালন করিতে হইলে, নিশ্চয়ই গুণময় রামচন্দ্র এ অধমানুজকে বর্জ্জন করিবেন, সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গেই এ রাম-বর্জ্জিত লক্ষ্ম-ণের জীবনান্ত ঘটিবে। তাহা হউক, তজ্জন্য এ কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বিপ্র-কিঙ্কর কণামাত্রও কাতর নহে। কিন্তু দেব! লক্ষ্মণান্ত হইলে, সেই ভ্রাতৃ-প্রেমময়—সেই স্নেহ-প্রতিকৃতি—সেই লক্ষ্মণ-গত-প্রাণ রামচন্দ্রের কি দশা ঘটিবে, তাহাই কল্পনা করিয়া আমি শিহরিতেছি ও ভয়ে অবসন্ন হইতেছি।"

লক্ষ্মণের বাক্য সমাপ্তি-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই, নির্দ্দয় দুর্ব্বাসা ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—"রে! অধম লক্ষ্মণ! এখনও তুই কল্পনা করিতেছিস্, শিহরিতেছিস্, অবসন্ন হইতেছিস্? রে মূঢ়-মতি পাপ-বুদ্ধি! দুর্ব্বাসা তোর কবিত্ব-পূর্ণ করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া, কাতর হইবার ব্যক্তি নহে। থাক্ হত-ভাগ্য! তুই বিরলে বসিয়া কল্পনা-চক্ষে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন হেতু,

রামের দুরবস্থার আলেখ্য সন্দর্শন করিতে থাক্; আর অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে, ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা রঘুবংশের কি দুর্দ্দশা উপস্থাপিত করে, তাহার প্রত্যক্ষ অভিনয় সন্দর্শনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া থাক্।"

এই বলিয়া নিষ্করুণ দুর্ব্বাসা পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলে, লক্ষ্মণ মনে মনে আলোচনা করিলেন, এই প্রখ্যাত-তেজা ঋষি-সত্তমের ক্রোধাপনোদন না করিয়া, তাবৎ রঘু-বংশের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম। একমাত্র লক্ষ্মণের জীবনের বিনিময়ে, যদি তাবৎ রঘু-কুলের কল্যাণ অব্যাহত থাকে এবং এই অমিততেজা ঋষি-শ্রেষ্ঠের ক্রোধ-রূপ নিদারুণ অশনি-সম্পাত হইতে এই সমাদৃত ও সম্পূজিত রাজবংশের রক্ষা-সাধন করা যায়, তাহা হইলে তাহাই যে কর্ত্তব্য তৎপক্ষে সন্দেহ কি? যদি এই যৎসামান্য জীবন পর্য্যবসিত হইলে, কল্পনাতীত বিপদ্-বাত্যা ও বিঘ্ন-বারিদ বিদূরিত হইয়া, রঘু-রাজ-দ্বারে সুখময় শান্তি বিরাজ করিতে থাকে, তাহা হইলে তৎকার্য্য সম্পাদনে আর কাল-ব্যাজ কেন?"

এইরূপ আলোচনা করিয়া, লক্ষ্মণ, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া, বলিলেন,—"হে পবিত্রচেতা ঋষিরাজ! কৃপা করিয়া এ অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। এ অধম সেবক এতক্ষণ ভবদীয় আজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করিয়া যে দারুণ দুষ্কৃতি-সাধন করিয়াছে, তাহা ক্ষমার অযোগ্য হইলেও, হীনজনের অপরাধ বোধে, তাহা করুণা সহকারে বিস্মৃত হউন। ভবদীয় চরণ-রেণু-লোলুপ এই অকিঞ্চন সবিনয়ে আপনার পাদ-পুটে আবেদন করিতেছে যে, আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, দর্শন ও পদ-রজঃ প্রদানে রামচন্দ্রকে পবিত্রীকৃত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর

হউন। এ অধম লক্ষ্মণ, আপনাকে রাম-সমীপে উপস্থিত করিয়া দিয়া, চির-কৃতার্থতা লাভ করুক।"

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত দুর্ব্বাসা কহিলেন,—"রে লক্ষ্মণ! এতক্ষণে তোর অন্তরে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, ইহাও তোর সৌভাগ্য। চল্, অজ্ঞানান্ধ মূঢ়! কোথায় মহারাজ রামচন্দ্র আছেন, আমাকে সেই স্থানে সঙ্গে লইয়া চল্।"

তখন বিকল-চিত্ত লক্ষ্মণ মনে মনে আলোচনা করিলেন,—"হায়! অদ্যই আমার জীবনের শেষ দিন। হা গুণময় রামচন্দ্র! এ অধম লক্ষ্মণ অদ্য হইতে আর তোমার চরণ-সেবা করিতে পাইবে না; তোমার এই বৎসল ভক্ত আর তোমার পাদ-পদ্ম সন্দর্শন করিতে পাইবে না; তোমার এই চিরানুগত দাস আর তোমার সঙ্গ-সুখ সম্ভোগ করিতে পাইবে না। হা অভাগা লক্ষ্মণ! তোর অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভক্তি-ভরে নিরন্তর সেই রাম-চরণ চিন্তা করিতে থাক্।"

তিনি, অন্তরের তীব্র জ্বালা মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে না জানাইয়া, অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিলেন এবং, রামের গৃহ-সন্নিহিত হইয়া, মনে মনে বিচার করিলেন,—"এই দ্বার মধ্যে যে মুহূর্ত্তে আমার মস্তক প্রবিষ্ট হইবে, তৎক্ষণাৎ আমাকে রাম-পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই পাদমেয় ভূমিই এক্ষণে আমার জীবন ও মরণের ব্যবধান। মরণ মনুষ্য-জীবনের অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। কিন্তু রে দুষ্কৃতকারী পাপাধম লক্ষ্মণ! তুই এমনই অভাগা যে, রাম-পরিত্যক্ত হইয়া তোর জীবনান্ত ঘটিল। বিধাতৃ-বিহিত-মার্গ কেহই অতিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে। অতএব ভাবিয়া

কি ফল? পশ্চাতে কুপিতান্তক দুর্ব্বাসা দণ্ডায়মান। তাঁহার ক্রোধে সর্ব্বনাশ। সম্মুখে মৃত্যু। সর্ব্বনাশাপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

এইরূপ আলোচনা করিয়া, কম্পিত-কলেবর, মর্ম্মাহত লক্ষ্মণ রামের গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সংক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—"মহারাজ! দ্বারে মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজ-দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতেছেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"রে লক্ষ্মণ! রে রামের জীবন! তুই আজি কি করিলি? হা ভগবন্! এই রূপেই কি তুমি রাম-জীবনের অবসান করিবে স্থির করিয়াছ? ভাই লক্ষ্মণ! প্রেমময় লক্ষ্মণ! আজি রামের জীবন সমাপ্ত হইল। এ কি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি কেন? কই লক্ষ্মণ! কোথায় ভ্রাতঃ! আমার সম্মুখে আইস। কই ভ্রাতঃ! হা রাম-নয়ন! যতক্ষণ সক্ষম আছ, ততক্ষণ লক্ষ্মণ-দর্শনে ক্ষান্ত কেন? কই লক্ষণ—লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—"এই বলিতে বলিতে সত্যবদ্ধ রামচন্দ্র, সংজ্ঞাহীন হইয়া, ছিন্ন-মূল পাদপের ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন।

তখন রোরুদ্যমান কাতর ও মৃত-কল্প লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চৈতন্য সংবিধানার্থ বিহিত-বিধানে যত্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই অপরিচিত ঋষি এই অবসরে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণের শুশ্রূষায় রামের চৈতন্য পুনরাগত হইবার উপক্রম হইল। তখন রোষাবিষ্ট দুর্ব্বাসা সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"হে ভুবন-বিখ্যাত সত্য-নিষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র! এইরূপ ঋষি-অবমাননাকারী সুনীতি তুমি কত দিন হইতে অবলম্বন করিয়াছ? চিরযশোধাম রঘুবংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া, কত দিন হইতে তুমি

এবংবিধ উপায়ে কীর্ত্তি-কলাপ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছ? ঋষি ও বিপ্র সমাগত হইলে, তোমার সুযোগ ও অবসর প্রতীক্ষায়, দ্বারে অপেক্ষিত থাকিবার সুব্যবস্থা তুমি কত দিন হইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছ?"

তপোধনের এই কঠোর বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, শোক-মুগ্ধ রামচন্দ্রের সংজ্ঞা জন্মিল। তখন তিনি, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, সকাতরে বলিলেন,—"হে ঋষি-রাজ! অদ্য এ চির-শোকাতুর রামের জীবন যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণার সীমা অতিক্রম করিবে। এ অন্তিম সময়েও, হে ভগবন্! শোকোন্মত্ত হইয়া, রাম কর্ত্তব্য-সেবায় বিমুখ হইবে না। হে ভূদেব! আশীর্ব্বাদ করুন, নিরতিশয় দুর্ব্বিসহ সত্য-পালনেও রাম যেন পশ্চাৎপদ না হয় এবং, নিদারুণ অন্তর্জ্বালার প্রাবল্যে, সে যেন পূজ্য জনের আজ্ঞা-পালনে অবহেলা না করে। রে ব্যথিত, বিধ্বস্ত রাম-হৃদয়! শান্ত হও। সত্যের স্বর্ণ-প্রতিমা সম্মুখে সন্দর্শন কর; কর্ত্তব্যের ভাস্বর কান্তি নিয়ত মানস-নয়নের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া রাখ। যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ সত্য ও কর্ত্তব্যের সেবা করিতে ক্ষান্ত হইও না। হে দয়াময় ঋষি-রাজ! অনায়ত্ত কারণে, আপনাকে অপেক্ষিত রাখিয়া, যৎপরোনাস্তি দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছি। সেই অপরিসীম দুষ্কৃতি, ক্ষমার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও, আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া ক্ষমা করুন। আপনি চিরদিন রঘুবংশের শুভানুধ্যায়ী ও রক্ষাকর্ত্তা। রঘুকুলের এই অধম সন্তান, ভক্তি সহকারে ভবদীয় চরণাম্বুজ-রজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া, সবিনয়ে আপনার প্রীতি ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। তপোধনের কোন্ বাসনা পূরণ করিয়া, এ পতি-

অধম কৃপা লাভে সমর্থ হইবে, তাদৃশী আজ্ঞা করিয়া এ হীন-জনকে কৃতার্থ করুন।"

তখন দুর্ব্বাসা, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, কহিলেন,—"হে রঘু-নাথ! তোমার বাক্যে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি চিরদিন সত্য-পরায়ণ ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ। আশীর্ব্বাদ করি-তেছি, তোমার দ্বারা কদাপি সত্যের অবমাননা হইবে না এবং কর্ত্তব্যের অবহেলা ঘটিবে না। হে নরনাথ! সম্প্রতি আমি নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া, তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। তুমি অবিলম্বে, আমার জঠরানল নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত কর।"

তখন রামচন্দ্র সানুনয়ে নিবেদন করিলেন,—"অহো! কি সৌভাগ্য! এ দাসের প্রতি আপনার কি অপরিসীম অনুগ্রহ।"

অনতিকাল মধ্যে, রামচন্দ্রের আদেশক্রমে, সেই স্থানে নানাবিধ সুরস খাদ্য ও পানীয় সমানীত হইল। ক্ষুধাতুর দুর্ব্বাসা, তৎসমস্ত ভোজন করিয়া, পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং, রামচন্দ্রকে বারংবার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, প্রসন্ন মনে, প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র উন্মত্ত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ক্ষুধা—ক্ষুধা—হে মহাভাগ! তোমার এই মহাক্ষুধার কি মহা-ভয়ঙ্কর পরিণাম! তোমার এই জঠরানলে রামের হৃৎ-পিণ্ড আহুতি হইল। তোমার ক্ষুন্নি-বৃত্তির জন্য আজি রাম-লক্ষ্মণের জীবনান্ত হইল। হউক, যাহা হয় হউক, সত্য-পালনে যেন চলচ্চিত্ত না হই; মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যেন ধর্ম্ম-সেবায় কাতর না হই; স্নেহে বদ্ধ

হইয়া যেন বাও্‌নিষ্ঠ-ব্রত-পালনে অক্ষম না হই। রাম-হৃদয়! তুমি ধন্য! তুমি এ কঠোর ক্ষেত্রেও ধৈর্য্য-হীন হইয়া তাপস-সেবায় অক্ষম হও নাই, ইহা আমার অসীম আনন্দের বিষয়।

"কর্ত্তব্যের একাংশ মাত্র সম্পন্ন হইয়াছে—মুনি-মনোরঞ্জন সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু—অহো কি ভয়ানক! কর্ত্তব্যের অসহনীয়, অচিন্তনীয়, অপরাংশ এখনও অসম্পন্নই রহিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—সত্য পালনার্থ আমি বাধ্যাধ্য। রাম কি এতদিন পরে সত্যের অবমাননা করিবে? প্রতিজ্ঞা-পালনে অক্ষম হইয়া, রাম কি এত দিন পরে, অধর্ম্ম-পঙ্কে নিমজ্জিত হইবে? না না, তাহা অসম্ভব। প্রাণ তো চিরস্থায়ী নহে—মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী নিয়ত—অদ্যই [হউক, বা যুগান্তেই হউক, মৃত্যুর আক্রমণ অপরিহার্য্য। তবে কেন সত্য-রক্ষায় বিচলিত হইব? তবে কেন, আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত, প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইব?

"কিন্তু কি ভয়ানক! রে রাম! তুই কি ভাবিতেছিস্? তুই যে সত্য-পালনের জন্য ব্যাকুল হইতেছিস্, যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য উৎসুক হইতেছিস্ তাহার পরিণাম এক-বারও ভাবিয়া দেখিতেছিস্ কি? তোর সত্য-পালনের ফল লক্ষ্মণ-বর্জ্জন; তোর বাও্‌নিষ্ঠার পরিণাম মৃত্যু; তোর প্রতি-জ্ঞার নিয়তি হৃদয়-বিদারণ।

"না না—লক্ষ্মণ-বর্জ্জন! ইহা কি সম্ভব? ইহা কি সাধ্য? অগ্রে মৃত্যু না ঘটিলে, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন অসাধ্য। না না, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। অধর্ম্ম হয়, হউক; রাম-নাম চির-কলঙ্কিত হয়, হউক; রাম-চরিত্র চির-নিন্দার আস্পদ হয়, হউক;

রামের আত্মা চির দিন নিরয়-বাসী হয়, হউক। তথাপি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন! অহো অসম্ভব। পৃথিবী রসাতলে যাউক, দিবাকর কক্ষ-ভ্রষ্ট হউক, চির-পুণ্যময় পিতৃপুরুষগণ আমাকে অভিসম্পাত করিতে থাকুন, তথাপি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন নিতান্ত অসাধ্য ও একান্ত অসম্ভব। ধিক্ সে কল্পনায়! ধিক্ সে চিন্তায়!"

রামচন্দ্রের এইরূপ ব্যাকুল ভাব ও উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া, রাজ-কর্ম্মচারিগণ ও কৈকেয়ী-নন্দন ভরত, নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া, তাঁহার সমীপাগত হইলেন, এবং কুল-পুরোহিত ও হিত-কাম মন্ত্রী মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র নিতান্ত অস্থির ভাবে সেই কক্ষে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এবং কর্ম্মচারিগণের বদন লক্ষ্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, —"কিন্তু লক্ষণ কই? আমার প্রাণের প্রাণ, আমার নয়নের মণি লক্ষ্মণ কোথায়? তোমরা জান কি কেহ, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব লক্ষ্মণ কোথায় লুকাইয়া আছে? তোমাদের চরণে ধরি, তোমরা আমাকে বলিয়া দেও, আমি কোথায় গেলে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ পাইব! আমি তো তাহাকে বর্জ্জন করি নাই; আমি তো তাহাকে বর্জ্জন করিতে অক্ষম; তবে সে কোথায় গেল? আমি তো এখনও জীবিত আছি। তাহাকে বর্জ্জন করিলে নিশ্চয়ই আমার জীবনান্ত হইত; কিন্তু তাহা তো হয় নাই। তবে সে কোথায় গেল? তবে কি বজ্রোপম, বর্জ্জন-বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে আশঙ্কা করিয়া, অগ্রেই সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? তবে কি সত্যই লক্ষ্মণ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে? রে লক্ষ্মণ-হীন পাষাণ রাম! কোন্ লজ্জায় তুই এখনও

জীবিত আছিস্ ? রে লক্ষ্মণ ! প্রেমময়, প্রীতিময়, আনন্দময় লক্ষ্মণ ! আয় ভাই, বারেক দেখা দে ভাই। জানি না, কতক্ষণে এ পাষাণ প্রাণ দেহত্যাগ করিবে। কিন্তু যতক্ষণেই হউক, ততক্ষণও তো তোর বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে পারি না। আয় ভাই! একবার দেখা দে ভাই। এ মরণ-কালে একবার তোর চন্দ্র-বদন দেখিতে দে ভাই! লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—ভাই রে লক্ষ্মণ" বলিতে বলিতে, বাতাহত পাদপের ন্যায়, সংজ্ঞা-হীন হইয়া, রামচন্দ্র ভূপতিত হইলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, দূত-মুখে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত কাতর ভাবে তথায় সমাগত হইলেন এবং, রামচন্দ্রের শোকাকুল অবস্থা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সমবেদনাযুক্ত ভরত, নানা উপায়ে রামের চৈতন্য সম্পাদন করিলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কই লক্ষ্মণ? কোথায় লক্ষ্মণ?" এই বলিয়া স্নেহময় রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে নেত্র-পাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি লক্ষ্মণের সেই সুকো-মল বদন-কমল তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইল না।

তদনন্তর ভরতকে লক্ষ্য করিয়া এবং সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, রামচন্দ্র সরোদনে বলিতে লাগিলেন,—"কে তুমি? তুমি কি ভরত? ভাই ভরত! অদ্য আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; অদ্য রঘু-কুল-চূড়ামণি লক্ষ্মণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ভ্রাতঃ! আমি নয়ন-হীন—জ্ঞান-হীন ও জীবন-হীন হইয়াছি। সংসার তো শূন্য; বসুধা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং বিশ্ব-সংসার নিরানন্দ-নিকেতন হইয়াছে। সুতরাং, ভ্রাতঃ ভরত! আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে। এক্ষণে হে ভ্রাতঃ! না—না—আর আমি তোমাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিব না। এ ভাগ্য-হীন রামচন্দ্র যাহাকে ভ্রাতৃ-

সম্বোধন করে তাহাকে যাবজ্জীবন যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হয়। এ নিষ্ঠুর, নির্ম্মম রাম পরম গুণময় নিষ্পাপ অনুজকেও পরিত্যাগ করে। অহো ভরত! যাও ভাই! আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন কর; এ পাতকীর সংস্পর্শ হইতে সুদূরে প্রস্থান কর। রামের সান্নিধ্যে সমাগত হইও না ভাই; ইচ্ছা পূর্ব্বক এ জ্বলন্ত পাবকে হস্তক্ষেপ করিও না ভাই। রাম চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। এ বজ্র-হৃদয় রামের আত্মীয়-বর্জ্জনই প্রিয় কার্য্য। যাও গুণময়, যাও স্নেহময়, বিলম্ব করিওনা, এখানে অপেক্ষা করিও না, আমার রোদনে কাতর হইও না। রোদনই আমার অবলম্বন, যাতনাই আমার যথোপযুক্ত পুরস্কার এবং আর্ত্তনাদই আমার অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। না ভাই, যাইও না ভাই, মুহূর্ত্তমাত্র এ অভাগার নয়নান্তরালে যাইও না ভাই। হে ভ্রাতঃ! যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ ভ্রাতৃ-সংসর্গ পরিত্যাগ করিব না। আমি পাষাণ-প্রাণ বলিয়া এ নিদারুণ দুঃসময়ে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। হে গুণময়! অচিরে আমার জীব-লীলা সমাপিত হইবে। তোমরা যাবজ্জীবন আমার নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ। আর কিয়ৎকাল মাত্র মৎসন্নিধানে অবস্থান করিয়া, আমাকে চির-বিদায় প্রদান কর ভাই। কোথায়-শত্রুঘ্ন? ভ্রাতঃ ভরত! ত্বরায় শত্রুঘ্নকে আমার সম্মুখস্থ কর। জীবনান্ত সময়ে, তাহার চন্দ্র-বদন সন্দর্শন করিতে না পাইলে, নিতান্ত কাতর হইব। কিন্তু সে কি আমার নিকট আসিবে না? সেও কি বর্জ্জন-ভয়ে এ চণ্ডালের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে? আমার লোক-লীলা সম্বরণের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। শত্রুঘ্নের সমীপে এই সংবাদ সত্বর প্রেরণ কর ভাই। কিন্তু অসাধ্য-সাধন-সক্ষম

ভরত! প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে আর একবার দেখাইতে পার না কি ভাই? আমি তো তাহাকে বর্জ্জন করি নাই। তবে সে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিল? রে লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!" এই বলিতে বলিতে, শোকাকুল রামচন্দ্র পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন রোরুদ্যমান ভরত বিহিত যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্য-বিধান করিলে, তিনি বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"এ কে? বশিষ্ঠদেব! হে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষে! আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, আমার প্রাণের প্রাণ লক্ষ্মণ কোথায় আছে। দয়াময়! বলুন প্রভো! কোথায় গেলে তাহার সাক্ষাৎ পাইব। আমি তো তাহাকে বর্জ্জন করি নাই। তবে সে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিল?"

তখন, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া, ভরত বলিলেন,—"হে রঘু-কুল-প্রদীপ! আপনি স্থির হউন। জীবিতাধিক লক্ষ্মণ এখনও এই রাজ-পুরেই অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ত্বরায় ভবৎ-সমীপে আনয়ন করিতেছি।"

তখন ব্যাকুল ভাবে রাম বলিলেন,—"কোথায় লক্ষ্মণ? চল, আমাকে তাহার সমীপে লইয়া চল। আমি তো তাহাকে বর্জ্জন করি নাই। তবে সে কেন আমার নিকটে আসিতেছে না?"

বশিষ্ঠ বলিলেন,—"রঘুনাথ স্থির হও। যাও ভরত, অবিলম্বে লক্ষ্মণকে রাম-সন্নিধানে আনয়ন কর।"

অনতি কাল-মধ্যে, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, ভরত সেই স্থানে পুনরাগমন করিলেন। গলদশ্রু-লোচন, মৃতকল্প লক্ষ্মণ, গল-লগ্নী-কৃতবাসে ও অধোবদনে রামের সম্মুখে দণ্ডায়মান

হইলেন। লক্ষ্মণকে দর্শন মাত্র রামচন্দ্র ব্যাকুলভাবে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার বদন চুম্বন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"ভাইরে লক্ষ্মণ! রামের হৃদয়-ধন, রামের জীবন-সর্ব্বস্ব! আমি তো তোমাকে বর্জ্জন করি নাই ভাই। তবে ভাই তুমি এতক্ষণ কোথায় লুকাইয়া ছিলে? আর আমি তোমাকে বক্ষঃস্থল হইতে অবতারিত করিব না। আর আমি তোমাকে নয়নান্তরালে যাইতে দিব না। আর আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার সঙ্গ-শূন্য হইব না। না না। আমার তো এখনও প্রাণ আছে; এখনও তো আমি, লক্ষ্মণকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অপার্থিব হৃদয়-সুখ সম্ভোগ করিতেছি। তবে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন কিরূপে সম্ভব! আমার জীবন থাকিতে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন কদাপি ঘটিতে পারে না। না রে ভাই! আমি তো তোকে বর্জ্জন করি নাই।"

পরে লক্ষ্মণের বদন সন্দর্শন করিয়া পুনরায় গুণময় রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"কেন ভাই লক্ষ্মণ! তুমি নীরব কেন? তোমার চন্দ্র-বদন মলিন কেন? একি গুণ-ধর! তোমার নয়নে জল কেন? কিসের ভয়? কেন তুমি আশঙ্কিত? আমি তো তোমাকে বর্জ্জন করি নাই। সত্য—ঋষি-বাক্য। রামচন্দ্র সত্যবদ্ধ; রামচন্দ্র ঋষি-সমীপে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। কিন্তু কিসের সত্য, কিসের সে প্রতিজ্ঞা। কাজ নাই—সত্যে কাজ নাই—প্রতিজ্ঞায় কাজ নাই। লক্ষ্মণের জন্য সকল পাপই কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণের বিনিময়ে স্বর্গও পরিত্যাজ্য। আজন্ম কায়মনোবাক্যে সত্যের সেবা করিয়াছি; জ্ঞানতঃ কদাপি প্রতিজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হই নাই। কিন্তু আজি—আজি আমি সত্যের আদর করিতে অক্ষম। আজি আমি প্রতিজ্ঞা-পালনে অক্ষম। নরক—

সত্যাবমননাকারীর নরক—প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর নরকই শাস্তি। তাহা হউক, নরক হউক। প্রাণের প্রাণ লক্ষ্মণ তো আপাততঃ আমার বক্ষে থাকিবে? তবে পরিণামের নরক-চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। হউক নরক, হউক সর্ব্বনাশ। লক্ষ্মণকে আমি কদাপি নয়নান্তরালে থাকিতে দিব না। তবে ভাই! তোর কিসের ভয়? তবে ভাই তুই কাতর কেন? না ভাই, আমি তো তোকে বর্জ্জন করি নাই।"

তখন কাতর লক্ষ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'হা বিধাতঃ! এক্ষণে পূজ্যতম আর্য্যের স্নেহ-পরায়ণ হৃদয়কে সাধু-সম্মত প্রকৃষ্ট-পথে পরিচালিত করিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। রামচন্দ্র সত্যাবতার ও মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম-স্বরূপ। সামান্য লক্ষ্মণের মায়ায় রঘুনাথ যেরূপ বিকল-চিত্ত হইয়াছেন, ধৈর্য্যের পর্ব্বত-প্রতিম পূজ্য-পাদ আর্য্য যেরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহাতে চিরাভ্যস্ত কর্ত্তব্যানুসরণে সহজে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে এরূপ অনুমান হইতেছে না। এক্ষণে রে লক্ষ্মণ-হৃদয়! তুই যেন, বিচ্ছেদ-ভয়ে অভিভূত হইয়া, আর্য্যের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-পথে প্রতিবন্ধকতা না করিস্। রে তাপিত লক্ষ্মণ! রঘুনাথের বদনারবিন্দ হইতে তোর বর্জ্জন-ব্যবস্থা বিনির্গত হইলেই আর্য্যের মহামহিম, গৌরবান্বিত নাম, জগতীতলে অধিকতর মহিমান্বিত ও গৌরবাস্পদ হইয়া, চির-সম্পূজিত হইতে থাকিবে। রে অধম লক্ষ্মণ! রাম-পরিত্যক্ত হইলে যদিও তুই প্রাণহীন হইবি, তথাপি সাবধানতা সহকারে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সাহায্যে, রঘুনাথকে কর্ত্তব্য-সাধনে সহায়তা করিতে নিযুক্ত হ। তুচ্ছ লক্ষ্মণের যৎসামান্য জীবন অপেক্ষা সত্য-পরায়ণ রঘুনাথের সত্য-পালন যে বহুগুণে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান

ব্যাপার, একথা যেন তোর হৃদয় হইতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও, অন্তরিত না হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লক্ষ্মণের জন্য, আজন্ম সত্য-সেবক রামচন্দ্রকে, যেন ক্ষণমাত্রও সত্য-পালনে অক্ষম হইতে না হয়।'

এইরূপ আলোচনা করিয়া এবং সযত্নে অন্তর-বেদনা সঙ্গোপিত রাখিয়া, সদ্বিবেচক-চূড়ামণি লক্ষ্মণ বলিলেন,—"হে প্রভো! হে ধার্ম্মিকোত্তম! হে সর্ব্ব-সদ্‌গুণাধার! এই ক্ষুদ্র ও হীন লক্ষ্মণের মায়ায়, আজি আপনার বদন হইতে একি নিন্দনীয় বাক্য বিনির্গত হইতেছে? হে ধর্ম্ম-ব্রত! নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান হেতুই রঘুবংশ জগন্মান্য এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত। আপনি সেই সুবিমল সূর্য্য-বংশ-সরসীর সরোরুহ। সত্য ও সদনুষ্ঠান ভবদীয় সুনামের সহিত অভিন্ন-ভাবে সম্বদ্ধ। নিতান্ত দুষ্কর ও সবিশেষ কষ্টপ্রদ হইলেও, সুপবিত্র-সত্য-সেবায়, পূজ্য-পাদ রামচন্দ্র কদাপি পশ্চাৎ-পদ হন নাই। এই জন্যই রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র, আদর্শ-জ্ঞানে, বসুন্ধরার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সমাদর সহকারে, প্রতিনিয়ত তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম উচ্চারণ করিতেছে। সামান্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এবং অতি তুচ্ছ লক্ষ্মণ-মায়ায় বিমোহিত হইয়া, হে পুণ্যময়! আপনি আজি কেন এত চলচ্চিত্ত হইতেছেন এবং, সনাতন সত্য-পালনে বিমুখ হইয়া, নীতি-বিগর্হিত কুপথানুসরণে ইচ্ছুক হইতেছেন? হে রঘুনাথ! অধুনা লক্ষ্মণ-বর্জ্জন আপনার অবশ্য-কর্ত্তব্য। এ চির-কিঙ্কর, সকাতরে আপনার চরণ ধারণ করিয়া, প্রার্থনা করিতেছে যে, অবিলম্বে তাহার প্রতি বর্জ্জন আদেশ ব্যক্ত করিয়া, জগতী-তলে অতুলনীয় কীর্ত্তি বিস্তার

করুন, ঋষি-বাক্যের যথোপযুক্ত সম্মাননা করুন, তপোধনের আশীর্ব্বাদ সফলিত করুন এবং সত্যোদ্দীপ্ত রাম-নাম অধিকতর প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করুন।”



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ, কহিলেন,—"রে নির্ম্মম লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই বজ্র-দ্বারা তোমার হৃদয় সঙ্গঠিত। নতুবা এরূপ অসহনীয় জ্বালা-জনক ও হৃদয়-বিদারক বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতে তুমি কদাপি সাহসী হইতে না। রে পাষাণ-প্রাণ, বজ্র-হৃদয় লক্ষ্মণ! সকলেরই সহিষ্ণুতার সীমা আছে এবং ধৈর্য্যের পরিমাণ আছে। সেই সীমা পর্য্যন্ত সকলেই, সাধু-সম্মত পথানুসরণ করিয়া, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সক্ষম। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া এক পদও অগ্রসর হওয়া অসাধ্য। যে সীতা রামের হৃদয়-নিধি, যে জানকী রামের জীবনের সার-রত্ন, যে মৈথিলী রামের আনন্দের উৎস, উৎসাহের নিকেতন, অনুরাগের আধার, প্রণয়ের প্রস্রবণ, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সীতা, চিরদিনের জন্য রাম-সন্নিধান হইতে. মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন; রাম তাহা সহ্য করিয়া নীরবে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-সেবায় কালাতিবাহিত করিতেছে। হৃদয় ছিন্ন,

ভিন্ন, দলিত ও মথিত হইলেও, রাম সে যাতনা ধীরভাবে সহিয়া আসিতেছে। কিন্তু রে প্রাণাধিক! তুই আজি এ কি কথা বলিতেছিস্? লক্ষ্মণ-বর্জ্জন? অহো অসম্ভব—অসম্ভব! রামের সহিষ্ণুতার বন্ধন, এই কল্পনাতীত কথা স্মরণ করিলেই, ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; তাহার ধৈর্য্য-বাধা, এই প্রাণান্তকর প্রসঙ্গের আলোচনা করিলেই, উন্মূলিত হইয়া যাইতেছে। অতএব রে প্রাণাধিক! তুই আর এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া আমাকে ব্যথিত ও কাতর করিস্ না। প্রতিজ্ঞা-পালন ও সত্য-সেবা সততই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই; কিন্তু রে ভ্রাতঃ! অকরণীয় ও অসাধ্য ধর্ম্ম কেহই কদাপি পালন করিতে সমর্থ নহে। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের প্রসঙ্গই যখন এতাদৃশ অসহনীয়, তখন তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বথা অসম্ভব। তজ্জন্য যে অধর্ম্ম সঞ্চিত হইবার তাহা হউক। রাম অবনত মস্তকে সেই পাপের ভার বহন করিতে সম্মত আছে; কিন্তু এরূপ বিসদৃশ ও অন্তর্জ্বালাপ্রদ কল্পনাকেও সে কদাপি হৃদয়ে স্থান দিতে সম্মত নহে। অতএব রে জীবনানন্দ লক্ষ্মণ! তুই আর, বারংবার এই কুৎসিৎ প্রসঙ্গ উচ্চারণ করিয়া, আমাকে ব্যথিত ও বিকল-চিত্ত করিস্ না।”

তখন সাশ্রু-নয়ন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন,—“হে রঘুনাথ! নিরন্তর যাতনা-পরম্পরাই তো পুণ্যময় চিরস্মরণীয় রাম-চরিতের গৌরব। ধর্ম্ম ও সত্যানুরোধে, অপরিমেয় ক্লেশ-রাশি বহন করিয়াই তো রাম-নাম গৌরবান্বিত। সতত, অবিকৃত চিত্তে, সর্ব্ববিধ বিপদের সম্মুখীন হইয়াই তো রাম-জীবন অতুলনীয় ও সর্ব্ব-সমাদৃত। হে পুণ্য-স্বরূপ! পিতৃসত্য-পালনার্থ নবীন বয়সে, জটা-বল্কল ধারণ করিয়া, সুদীর্ঘ

বনবাস ; ধর্ম্মানুরোধে, পাপ-সম্ভাবনা-বিরহিতা জানকীর কঠোর পরীক্ষা ; প্রজারঞ্জনানুরোধে, তাঁহার সততার সুস্পষ্ট সমর্থনান্তেও, তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে সঙ্কোচ ; ভবদীয় জীবন-ব্যাপী ইত্যাকার ব্যাপারসমূহ, নিরতিশয় যাতনাপ্রদ হইলেও, রাম-চরিতের মহত্ত্ব-বিষয়ক অখণ্ডনীয় নিদর্শন। হে মহা-ভাগ! যে মহাপুরুষ, নিতান্ত কঠোর কর্ত্তব্য-পালনেও পশ্চাৎ-পদ হইয়া, কদাপি কু-কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন নাই ; অচিন্ত-নীয়, কল্পনাতীত ক্লেশ-প্রদ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেও, যাঁহার চির-প্রশান্ত ধৈর্য্যাব্ধি কদাপি আলোড়িত হয় নাই ; মর্ম্মান্তকারী যাতনা-পরম্পরার সম্মুখীন হইতেও, যাঁহার সহি-ষ্ণুতা-শৈল কদাপি বিচলিত হয় নাই ; অধুনা এই অপেক্ষা-কৃত সামান্যতর ব্যাপারে, সেই ধৈর্য্য-গিরি-স্বরূপ রাম-হৃদয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিমুখ হইলে নিতান্তই নিন্দার কারণ হইবে। যিনি স্বয়ং সত্য-স্বরূপ, সত্যানুষ্ঠানই যাঁহার প্রিয়-ব্রত, সত্য-স্বরূপ কষিত কাঞ্চনই যাঁহার প্রধান ভূষণ, সেই চির-সত্য-পরায়ণ রামচন্দ্র, আজি সত্য-পন্থানুসরণে শিথিল-পদ হইলে, বসুন্ধরা হইতে সত্যের সম্মান বিলুপ্ত হইবে। ধর্ম্মব্রত রঘু-রাজ-কুলে যাঁহার জন্ম, পরম সত্য-নিষ্ঠ রাজা দশরথ যাঁহার জনক, যিনি স্বয়ং সত্য-পরায়ণগণের শীর্ষ-স্থানীয়, সেই সাধু-চূড়ামণি রামচন্দ্র আজি সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হইলে, সংসারে সত্যের আর সমাদর থাকিবে না। অতএব হে মহাপুরুষ! আমি সানু-নয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি, হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া, বিহিত পন্থা নির্ব্বাচন করুন। বিশুদ্ধ রাম-চরিত্রে কদাপি কলঙ্ক-শ্যামিকা স্পর্শ করিতে দিবেন না, ইহাই এ অনুগত অধীন সেবকের একমাত্র প্রার্থনা।”

এই বলিয়া, নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে, লক্ষ্মণ, উভয় বাহুর দ্বারা, রামের চরণ-যুগল বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

তখন কাতর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে স্বীয় পাদ-মূল হইতে উত্তোলন করিয়া, শোক-সঙ্ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—“রে নিষ্ঠুর! বুঝিলাম তুই হৃদয়-হীনের একশেষ। তোর অনুরোধ-পূর্ণ যুক্তিসমূহ আমার হৃদয়ে শেল-সম বিদ্ধ হইতেছে। বৎস! তুমি চির-দিনই আমাকে পরম দেবতা জ্ঞানে, মৎকৃত আদেশ-সমূহ অবনত মস্তকে পালন ও, মদীয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্ব ব্যাপারের ব্যবস্থা করিয়া থাক। তবে ভ্রাতঃ! আজি কেন তুমি আমাকে স্বীয় মতে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইতেছ? না ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও। আমি তোমার যুক্তির পথে বিচরণ করিব না। আমার অনুজ-গণের উপর আমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। আমি সেই বলেই তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি নিরস্ত হও। আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না। লক্ষ্মণ-বর্জ্জন অসাধ্য ও অসম্ভব। আমি তাদৃশ দুষ্কর কার্য্যের কদাপি অনুষ্ঠান করিব না।”

তখন লক্ষ্মণ পুনরপি সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—“হে প্রভো! হে দয়াময়! আজি অধম লক্ষ্মণ, আপনার বাসনার বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ও যুক্তির সাহায্যে ভবদীয় অভি-প্রায়কে স্বানুকূলে সমানয়নের প্রযত্ন করিয়া, নিতান্ত স্পর্দ্ধিত ব্যবহার করিতেছে এবং চিরন্তন সৎ-পদ্ধতি হইতে স্খলিত-পদ হইতেছে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু নরনাথ! অদ্যকার ব্যাপার অতি ভয়ানক এবং অসাধারণ। সুতরাং হে প্রভো! তাহার এ স্বাধীনতা অদ্য মার্জ্জনীয়।

হে ধর্ম্ম-ব্রত রামচন্দ্র! আপনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম স্বরূপ। এই দীন হীন ভবদীয় শ্রী-মুখ হইতেই ধর্ম্ম-তত্ত্বের সুপবিত্র বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছে। হে গুরো! আপনার সেই চিরানুগত শিষ্য ও সেবক আপনাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে কদাপি সাহসী ও সমুদ্যত হইতে পারে না। অতএব হে চির-ক্ষমাশীল গুরুদেব! অদ্য পরম স্নেহাস্পদ ও নিতান্ত করুণাভাজন লক্ষ্মণের প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। পরম পূজ্য আর্য্য! অতি অকিঞ্চিৎকর মায়ায় বিমোহিত হইয়া, অদ্য আপনি অতুলনীয় ধর্ম্ম-ধনকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতিনিন্দনীয় নীতির অনুসরণ করিয়া, সত্য-সরণি বর্জ্জন করিবার বাসনা করিয়াছেন। হে রঘুনাথ! ভাবিয়া দেখুন, অনন্ত সময়-সমুদ্রে এই লক্ষ্মণ অগণ্য জল-বুদ্বুদ-সমূহের অন্যতমমাত্র। অপরিমেয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে এই লক্ষ্মণ এক নগণ্য কণিকামাত্র। কাল-পারাবারের অপরিসীম বেলা-ভূমিতে এই লক্ষ্মণ এক অতিসূক্ষ্ম বালুকা-বিন্দুমাত্র। এই নশ্বর-দেহ-ধারী, নলিনী-দল-গত জল-বৎ বিচঞ্চল, লক্ষ্মণের মমতায়, আপনি সনাতন সত্য-ধর্ম্ম পালনে বিমুখ হইবার কল্পনাও মনে স্থান দিতেছেন, এতদপেক্ষা বিস্ময়-জনক ও হৃদয়-বিদারক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? হে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নরোত্তম! ইহ সংসারে ধর্ম্ম অবিনশ্বর, অনন্ত ও সর্ব্ব-ব্যাপী, ধর্ম্মের কাঞ্চনী কায়া চির-সমুজ্জ্বলা ও অবক্তব্যা তেজঃ-সম্পন্না। আপনি, কুৎসিত মোহাচ্ছন্ন হইয়া, সম্প্রতি জ্ঞান-নয়ন-বিহীন হইয়াছেন এবং, দুর্ব্বল-হৃদয় ও ক্ষীণ-চেতা জন-সাধারণের ন্যায়, চলচ্চিত্ত হইয়া চির-সেবিত ধর্ম্মের সেবায় অনিচ্ছুক হইতেছেন। হে

রাজন্! ভাবিয়া দেখুন! ইহ সংসারে ধর্ম্মের সমতুল্য আর কি সম্পত্তি আছে? ধন জন জীবন সকলই ক্ষণ-বিধ্বংসী ও মায়া-মরিচীকামাত্র। কেবল ধর্ম্মই চিরস্থায়ী, চির-সঙ্গী ও সার-সম্পত্তি। হে ধার্ম্মিকোত্তম! এই লক্ষ্মণ-রূপ জলবুদ্বুদ কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে; ভবদীয় ঐ পুণ্য-তেজঃ-পরিপূর্ণ পবিত্র কলেবরও, কালের প্রবল-শাসনাধীন হইয়া, ধ্বংস-দশা প্রাপ্ত হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ সমরে অটল, আধিপত্যে প্রতিদ্বন্দি-রহিত এবং ধন-জন-বত্তায় অতুলনীয় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা কালের কঠোর শাসন অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্রত পালন করিয়া ও নিরন্তর ধর্ম্ম-চর্য্যা করিয়া, যে ভু-লোক-দুর্ল্লভ কীর্ত্তি-কলাপ অর্জ্জন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর এবং অনন্তকালস্থায়ী। কাল তাঁহাদের সেই সকল সুপবিত্র কলেবর বিধ্বংসিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের পুণ্যার্জ্জিত কীর্ত্তি-শৈলের কণিকামাত্রও স্থান-ভ্রষ্ট, বা বিচূর্ণিত করিতে সক্ষম হয় নাই। হে রঘু-কুল-কেশরিন্! সেই মহদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, সেই মহাজনানুষ্ঠিত সুপবিত্র ক্রিয়া-কলাপের অনুকরণে আপনি কদাপি পরাঙ্মুখ হন নাই। সম্প্রতি সেই সাধু-সম্মত পথানুসরণে কেন আপনি পশ্চাৎ-পদ হইয়া কুকীর্ত্তি সঞ্চয় করিবেন? হে রঘুনাথ! ভাবিয়া দেখুন, অনন্ত-কাল-সমুদ্রে রাম ও লক্ষ্মণের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সত্যানুরোধে, যে রামচন্দ্র নবীন বয়সে জটা-বল্কলধারী হইয়া, সুদীর্ঘ কাল বিপদ্-বহুল ঘোরারণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অতুলনীয় কীর্ত্তির কথা বসুন্ধরা হইতে কদাপি বিলুপ্ত হইবে না। রাজ-ধর্ম্ম পালনানুরোধে, যে রাম-

চন্দ্র পুণ্য-প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক্ত বরবর্ণিনীকে বর্জ্জন করিয়া অতিক-নীয় দুষ্কর ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অতুল-নীয় কীর্ত্তির কথা বসুন্ধরা হইতে কদাপি বিলুপ্ত হইবে না। সেই অপাপ-বিদ্ধা নিষ্কলঙ্ক-স্বভাবা জানকীর জীবন অপগত হইতে দেখিয়াও, যে রামচন্দ্রের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটে নাই এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তি বিচলিত হয় নাই, তাঁহার সেই অতু-লনীয় কীর্ত্তির কথা বসুন্ধরা হইতে কদাপি বিলুপ্ত হইবে না। আজি সেই চির-পুণ্য-শীল সাধু-কুল-চূড়ামণি রামচন্দ্র, ক্ষুদ্র লক্ষ্মণের মায়ায়, সেই চির-বিচরিত সত্য-পথ হইতে স্খলিত-পদ হইলে, তাঁহার জীবনার্জ্জিত কীর্ত্তি-কলাপ ভস্মাহুতি-রূপ অনর্থক ও অনাদৃত হইবে। হে রঘুনাথ! তুলাদণ্ডের একদিকে ভবদীয় অকলঙ্ক যশোরাশি এবং অপর দিকে এই ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্রতর লক্ষ্মণের জীবন আরোপ করিয়া বিচার করুন; দেখিবেন, মহামহিম রামচন্দ্রের কীর্ত্তিপুঞ্জের দিক্, নিতান্ত গুরু-ভার হেতু, নিশ্চয়ই অবনত হইয়া পড়িবে। একদিকে সত্য ধর্ম্ম, অপর দিকে ক্ষুদ্র লক্ষ্মণ-বর্জ্জন-ব্যাপার সংন্যস্ত করিয়া দেখুন প্রভো! এখনই বুঝিতে পারিবেন, অবিলম্বে লক্ষ্মণ-বর্জ্জন করিয়া সত্যের সমাদর ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মব্রত! এ বিষয়ে আপনার ইতস্ততঃ করা শোভা পায় না। আপনি লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে বিমুখ হইলে, রাম-নাম চির-কলঙ্ক-হ্রদে নিমজ্জিত হইবে। রামচরিত রূপ পরম সুষমাবলম্বী রমণীয় উদ্যান দুষ্কীর্ত্তিরূপ কণ্টকী লতায় আকীর্ণ হইবে। রামানুষ্ঠিত অনন্ত কীর্ত্তি-স্তম্ভ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং পুণ্য-শ্লোক রামচরিত্রের চির-সুপ্রথিত সত্য-ধর্ম্মের দারুণ কলঙ্ক-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইবে। ক্ষুদ্র লক্ষ্মণের জন্য,

সংসার-সমুদ্রে ভাসমান এই ক্ষুদ্র তৃণ-কণিকার জন্য, আজি কি রামচন্দ্র এই সমস্ত অশুভ সংঘটনের সূচনা করিবেন? হে গুণময়! হে বিজ্ঞোত্তম! হে কীর্ত্তি-কেতন! আপনার এই কাতর কিঙ্কর অদ্য আপনার চরণ-সরসিজ হইতে সবিনয়ে বর্জ্জন-ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছে। আপনি তাহার কোন প্রার্থনা পূরণে কদাপি বিমুখ হন নাই; তাহার বাসনা নিবৃত্তি করিতে কদাচ পশ্চাৎ-পদ হন নাই। তবে আজি কেন সেই চিরানুগত দাসের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছেন না?"

এই বলিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ লক্ষ্মণ, পুনরায় রামচন্দ্রের পদ-দ্বয়, সকাতরে উভয় বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিলেন; কিন্তু রাম-চন্দ্র নিরুত্তরে ও অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে তখনও ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণ, উন্মত্ত-বৎ অস্থিরতা সহকারে, রাম-চরণ পরিত্যাগ করিয়া, গাত্রো-থান করিলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"এখনও আর্য্য চিন্তা-পরায়ণ, এখনও আর্য্য অস্থিরমতি। আর্য্য ভরত! এ জীবনের প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হইয়াছে; লক্ষ্মণের জীবন বিগত হইয়াছে। রঘু-কুল-প্রদীপ রামচন্দ্র সত্য পালনে বিমুখ, কীর্ত্তি-সেবকগণের শীর্ষ-স্থানীয় রামচন্দ্রের পুণ্যময় পবিত্র নাম কলঙ্কিত, সাধু-বৃন্দের দৃষ্টান্ত-স্থলীভূত রঘুনাথ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পশ্চাৎ-পদ, ইত্যাকার নিরতিশয় কর্ণ-জ্বালাকর ও অশ্রাব্য কলঙ্ক-ঘোষণা শ্রবণ ও মনন করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণ কদাপি ক্ষণকালও জীবিত থাকিবে না। হে ভ্রাতঃ! হে অভিন্ন-হৃদয়! অবিলম্বে এই পুরঃ-প্রাঙ্গণে অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত কর। পবিত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ও রাম-চরণ-

পঙ্কজ ধ্যান করিতে করিতে, সেই চিতানলে শয়ন করিয়া, লক্ষ্মণ অচিরে সকল জ্বালার শান্তি করিবে। হে অগ্রজ! আমার এই অন্তিম বাসনা সংপূরণ করিতে, তুমিও কি ভাই, ইতস্ততঃ করিতেছ? আজি রঘুনাথের ন্যায়, তুমিও কি আমার প্রতি করুণা-বিহীন হইয়াছ? রে লক্ষ্মণ! আজি সংসার তোর প্রতি মমতা-শূন্য, আজি বসুন্ধরার তাবতেই তোর প্রতি নিষ্করুণ। যে মহীরুহ-তলে তোর চিরন্তন আশ্রয়, যে করুণা-শৈল-মূলে তোর আজন্ম আশ্রম, যে শান্তি-কূপে তুই চির-নিমজ্জিত, যে অমৃতায়মানা করুণা-কৌমুদীতে তোর হৃদয় চির-সুস্নিগ্ধ, সেই করুণাশীল রামচন্দ্র যখন আজি প্রার্থনা পূরণে বিমুখ, তখন আর কে তোর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে? কিন্তু হে নির্ম্মম কাল! তুমি তো করুণা-কণা-বিবর্জ্জিত। এ দারুণ দুঃসময়ে, লক্ষ্মণের জীবনান্ত করিতে, তুমিও অগ্রসর হইতে পার না কি? আইস মৃত্যু! আইস অন্তক! এই যন্ত্রণা-ভীত, কলঙ্ক-কাতর লক্ষ্মণের জীবনান্ত করিয়া তাহার চির-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দেও। মৃত্যু! তুমিই অধুনা লক্ষ্মণের একমাত্র শরণ্য। কই মৃত্যু? কই মৃত্যু? ঐ যে—ঐ যে—" এই বলিতে বলিতে কাতর লক্ষ্মণের, বায়ু-বিতাড়িত বেতসবৎ বেপমান কলেবর, সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূ-পতিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া, রামচন্দ্র ত্বরিত তাঁহার সমীপাগত হইলেন এবং সকাতরে বলিতে লাগিলেন,—"হে পরম পূজ্য বশিষ্ঠদেব! আজি একসঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের প্রাণান্ত ঘটিবে। আজি আপনারা কৃপা করিয়া একত্র উভয়ের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করুন। আমরা উভয়ে দেহ ও প্রাণ, পদার্থ ও ছায়া, দিবাকর ও আলোক এবং বায়ু ও আকাশের ন্যায় চিরদিন অবিচ্ছেদ-ভাবাপন্ন। এ অন্তিম সময়েও, হে ভগবন্! যেন সে নিয়মের ব্যভিচার না ঘটে।"

অতঃপর সংজ্ঞাহীন লক্ষ্মণের শুশ্রূষা-পরায়ণ ভরতকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হে প্রিয়ানুজ ভরত! কেন আর তুমি সৌভাগ্যবান্ লক্ষ্মণের চেতনা-সংবিধানে প্রয়াসবান্ হইয়া তাহার যাতনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছ? বিধাতা কৃপা-পরবশ হইয়া উহাকে মোহাক্রান্ত করিয়াছেন। বৎস! উহার ঐ মোহ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহারই ব্যবস্থা কর। লক্ষ্মণ-বর্জ্জন অপরিহার্য্য।

প্রাণ তো ক্ষণস্থায়ী। তবে সে তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় কেন লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে বিমুক্ত হইব? কেন সত্যের অবমাননা করিব? কেন কুকীর্ত্তি সঞ্চয় করিব? লক্ষ্মণ-বর্জ্জন অসহনীয়ের পরাকাষ্ঠা সত্য; কিন্তু লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর, স্বতই রামের এ তাপিত প্রাণ পলায়ন করিবে। সুতরাং চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। অতএব হে ভ্রাতৃবয়! লক্ষ্মণের ঐ মোহ বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিও না। আমার বদন হইতে শেলোপম বর্জ্জন-বাক্য বিনির্গত হইলে, উভয়ের জীবনান্ত হওয়ার অপেক্ষা, এইরূপে আমাদের জীব-লীলার পরিসমাপ্তি হইতে দেও। রে ভাগ্যবান্ লক্ষ্মণ! বিধাতা তোর প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃপাবান্। এ দারুণ সময়ে তোর মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া, তিনি তোর সুখময়ী শান্তির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। অহো! অভাগা রামের পক্ষে কি তাদৃশ শুভ-সুযোগ সজ্যটিত হইবে না?"

রামচন্দ্র যখন এইরূপে পরিতাপ করিতেছেন, তখন লক্ষ্মণ চৈতন্য-লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন,—"অহো! কি ভয়ানক! কি বিষাদ-জনক দৃশ্য! ঐ দেখ! ঐ দেখ! বিগলিত-কুন্তলা রঘু-রাজ-লক্ষ্মী অধোবদনে রোদন করিতেছেন! আবার ঐ দেখ, আর্য্য ভরত! দেখ দেখ ধর্ম্মদেবতা, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তদীয় এই চিরন্তন নিবাস হইতে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন। কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! কর কি আর্য্য! অঞ্জলীকৃতবাক্যে ঐ দেবতার চরণ ধারণ কর। অহো! একি! এদিকে এ আবার কি অত্যুৎকট দৃশ্য! কে ও? ও কি! ও কে আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব রাজা দশরথের দেবমূর্ত্তি! তাঁহার পার্শ্বে বিভাবসু-সন্নিভ প্রদীপ্ত-কলেবর কে উনি? রঘুরাজ!

তৎপার্শ্বে উষ্ণীষ-ধারী বিশ্বামিত্র। কে ঐ মহাতেজস্বী সাধু? অহো উনিই কি দিলীপ? অহো! দেখ দেখ ভরত, আমাদের পুণ্য-কল্প পিতৃপুরুষগণ পুরোভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কিন্তু ভাই! সকলেরই নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে কেন? সকলেরই মূর্ত্তি নিদারুণ, ক্রোধে আরক্ত কেন? ঐ শুন, ভ্রাতঃ! ঐ শুন, পিতৃপুরুষগণ সমস্বরে অভিসম্পাৎরূপ নিদারুণ অশনি-নিক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে বিচূর্ণিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। ঐ শুন, ভ্রাতঃ! তাঁহারা স্বর্গীয় সুস্বরে সমস্বরে বলিতেছেন, 'যে নরাধমেরা আমাদের পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে অশক্ত, যে পাপিষ্ঠেরা এই সুমহান্ বংশের সন্তান হইয়া, সত্যপালনে পশ্চাৎ-পদ, তাহাদের জীবনে ধিক্! তাদৃশ কুসন্তান আমাদের চির-পরিত্যাজ্য।' কিন্তু এ কি ভ্রাতঃ! ঐ যায়—ধর, ঐ যায়! সত্য স্বীয় শ্বেত-পক্ষ বিস্তার করিয়া অবনীরাজ্য হইতে ঐ পলায়ন করিতেছেন! কোথায়? সত্যময় রামচন্দ্র কোথায়? দেখ মহারাজ! ধরা-ধাম হইতে সত্য-মূর্ত্তি পলায়ন করিতেছেন। ওকি! পিতৃপুরুষগণের ওকি করাল-মূর্ত্তি হইল! পলায়ন কর, ভাই হে! পলায়ন কর! ঐ আসিতেছে। পিতৃপুরুষগণের ক্রোধের শিখা, আমাদিগকে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত, প্রধাবিত হইতেছে। রক্ষা কর! পলায়ন কর। ঐ যায়! কোথায় প্রভু রামচন্দ্র? গেল—গেল! সৃষ্টি বিলুপ্ত হইল———"

এই বলিতে বলিতে ধর্ম্ম-ভীত লক্ষ্মণ আসিয়া রামচন্দ্রের বাহুমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবামাত্র, রঘুনাথ বলিয়া উঠিলেন,—

"রে লক্ষ্মণ! রে তাপিত প্রাণের শীতলাশ্রয়! রামের জীবিতা-

ধিক লক্ষ্মণ! এ বাহু-যুগলের মধ্যে আর তোর ইহ জীবনে স্থান হইবে না। রামের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির বাহু তোমাকে আর আশ্রয় প্রদানে অশক্ত। রাম সত্যবদ্ধ। ধর্ম্মের নিমিত্ত সুদীর্ঘকাল বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি; ধর্ম্মের নিমিত্ত জানকীর বিরহ-বেদনা বক্ষঃ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আজি আবার ধর্ম্মের নিমিত্ত আমি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন করিতেছি। আর আর সকল ব্যথাই নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু যে দারুণ বজ্র আজি বক্ষে ধারণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার আঘাত সহ্য করিতে আমি মুহূর্ত্তমাত্রও অশক্ত। সহ্য করিতে আমার সাধ্য নাই, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? সহ্য না করাই শ্রেয়ঃ। ধর্ম্ম তো রক্ষিত হইবে? সত্যের তো সম্মান থাকিবে? প্রতিজ্ঞা তো পরিপালিত হইবে? তজ্জন্য এ ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেই বা ক্ষতি কি? রে কাতর লক্ষ্মণ! এ রামের বাহু আর তোর আশ্রয় নহে। রাম তোমাকে অদ্য বর্জ্জন করিতেছে। সত্য-বদ্ধ রামচন্দ্র সত্যানুরোধে, রে আজন্ম সহচর লক্ষ্মণ! তোমাকে অদ্য বর্জ্জন করিতেছে। আর লক্ষ্মণ আমার কেহ নহে। অতঃপর লক্ষ্মণ আমার অতীতের স্মৃতি। এখন আইস মৃত্যু, আমি অসাধ্য-সাধন করিয়াছি। আমি প্রাণারাম লক্ষ্মণের সুকোমল বক্ষঃ-প্রদেশে স্বহস্তে ছুরিকাঘাত করিয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় ভ্রাতৃহত্যা করিয়াছি। এই অতি দুষ্কর পৈশাচিকী ক্রিয়া আমি সম্পন্ন করিতে সক্ষম কি না, দেখিবার নিমিত্তই, মৃত্যু তুমি এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলে। এখন আইস তুমি! রাম স্বচ্ছন্দে, নিজমুখে, সুস্পষ্ট ভাষায় লক্ষ্মণ-বর্জ্জনাজ্ঞা পরিব্যক্ত করিয়াছে। পিশাচ, নরাধম, চণ্ডাল, নর-হন্তা রামের পক্ষে কোন কর্ম্মই

অতিদুষ্কর বহে। এখন আর না—আর না; মৃত্যু! আর বিলম্ব সহে না। কৈ মৃত্যু—কৈ মৃত্যু—

এই বলিতে বলিতে রামচন্দ্র, হত-চেতন হইয়া, বাত্যাহত কদলী স্তম্ভের ন্যায়, ভূতলশায়ী হইলেন।

রামচন্দ্র এইরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইলে, লক্ষ্মণ, ভরতকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন,—"আর্য্য! বুঝি বা আজি রঘু-কুল-রবি অস্তাচলগত হইতেছেন; বুঝি বা অদ্য মেদিনী ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইতেছে; বুঝি বা অদ্য সংসারের সার-রত্ন অনন্ত-ধামে প্রয়াণের আয়োজন করিতেছেন; বুঝি বা অধুনা লক্ষ্মণের আন্তরিক আশঙ্কা ফলবতী হইবার উপক্রম হইতেছে। এ হীন লক্ষ্মণের মায়ায় রামচন্দ্র যেরূপ অভিভূত, এ দীন লক্ষ্মণের প্রতি রঘুনাথ যেরূপ স্নেহশীল, এ অধম জনের সহিত তাঁহার যেরূপ এক-প্রাণতা, তাহাতে আমার মনে এতক্ষণ বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত আমার বর্জ্জন-ব্যাপার রূপ তুমুল ঝটিকা রামচন্দ্রের হৃদয় এরূপ আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত করিবে, যে তাঁহার চির-শোক-সন্তপ্ত জীবন-বর্ত্তিকা তাহাতে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। বুঝি বা আমার সেই বিভীষিকা-পূর্ণ আতঙ্ক এতক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইবার সূচনা হইতেছে। হে আর্য্য! আমি তো এক্ষণে রাম-পরিত্যক্ত; সুতরাং জীবন-বিহীন। এ মৃত ব্যক্তির রাম-সমীপে অপেক্ষা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে কোনই অধিকার নাই। অতএব হে অগ্রজ! তুমিই বিহিত-বিধানে রঘুনাথের হৃদয়ে সংজ্ঞা সঞ্চারের ব্যবস্থা কর। হে কুল-গুরো বশিষ্ঠ দেব! হে আত্মীয় স্বজন ও অমাত্যগণ! আপনারা অনন্য-চিত্তে রামচন্দ্রের যথাবিহিত যত্ন করিয়া, ত্বরায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করুন।"

রোরুদ্যমান ভরতাদি সকলে, নানারূপ শুশ্রূষার দ্বারা, রামের চৈতন্য-সঞ্চারের যথাযোগ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"যতক্ষণ এই সর্ব্ব-গুণময় মহাপুরুষের মোহন কান্তি, মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, ভূ-পতিত থাকিবে, ততক্ষণই আমি এস্থানে অবস্থানের অধিকারী। তিনি আমাকে বর্জ্জন করিয়া, সদনুষ্ঠান-সৌধ-শিরে বাক্‌নিষ্ঠার বৈজ-য়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন এবং সত্যের সুদূরব্যাপী দুন্দুভি-নাদে দিঙ্মণ্ডল নির্ঘোষিত করিয়াছেন। ধন্য রামানুজ লক্ষ্মণ! আজি তোর সুকৃতি ও সৌভাগ্যের সীমা নাই। আজি প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ, রামচন্দ্র তোর প্রতি বর্জ্জন আদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন! যে প্রেমময় প্রেম-প্রাবল্যে অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও, সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া, মিত্রতার দুশ্ছেদ্য নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন; যাঁহার প্রেম-প্রবাহে অরণ্যচর জীব-সঙ্ঘও সন্ত-রণ-শীল; সেই লক্ষ্মণ-বক্ষোরত্ন কৃপাময় রামচন্দ্র যে আজি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহার অপেক্ষা দুষ্কর কীর্ত্তি কল্পনাতীত। হে ধর্ম্ম! আজি তোমার মহিমা সুরক্ষিত হইয়াছে। হে সত্য! আজি তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু রে লক্ষ্মণ-হৃদয়! তোর তো কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রঘুনাথের সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইবা-মাত্র, তুই তো নিশ্চয়ই বিগত-জীব হইবি। অতএব যতক্ষণ সাধ্য ও সামর্থ্য আছে, ততক্ষণ অনন্য-মনে হৃদয়-দেবতার এই জগন্মোহন চরণ-পঙ্কজ অনুধ্যান করিতে বিরত হইস্ না। রে লক্ষ্মণ-নয়ন! অনতিকাল মধ্যে তোর তো দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হইবে। অতএব, যতক্ষণ সুবিধা ও সুযোগ আছে, ততক্ষণ

নিরন্তর এই রাজীবলোচন রামচন্দ্রের রমণীয় রূপরাশি দর্শন করিতে বিরত হইস্ না। ইহাঁর সংজ্ঞা-সঞ্চার হইলে, যদি এই পরিত্যক্ত লক্ষ্মণের পতিত-মূর্ত্তি ইহাঁর নয়ন-পথে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সত্যের সম্মান সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইবে বোধ হয় না। অতএব, অগ্রেই আমাকে, ইহাঁর সান্নিধ্য হইতে, পলায়ন-পরায়ণ হইতে হইবে।"

এইরূপ সময়ে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাপনোদিত হইতেছে অনুমান করিয়া, লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"রে লক্ষ্মণ! এই তোর অন্তিম কাল আগত। হে অগ্রজ ভরত! হে চির-হিত-পরায়ণ মহর্ষে! হে শুভানুধ্যায়ী অমাত্যবৃন্দ! এই মরণ-কালে লক্ষ্মণ আপনাদের সমীপে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছে যে, আপনারা কৃপা সহকারে, রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ-বিয়োগ-কাতর হৃদয় প্রশান্ত করিতে সাধ্যমত প্রয়াসী হইবেন। যেন লক্ষ্মণের শোকে রামচন্দ্রের প্রাণান্ত না হয়। আর আমার বলিবার কোন কথাই নাই। হে রঘুনাথ! এ অধম লক্ষ্মণ, তোমার সুপবিত্র পাদ-পদ্ম হইতে, চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছে। জন্মান্তরে যেন তোমার চির-সঙ্গ লাভে সমর্থ হই। ঐ যে—ঐ যে রামচন্দ্রের সংজ্ঞাশূন্য মুকুলিত নয়ন স্পন্দিত হইতেছে। চলিলাম—আর না। হে অন্তক! রামাশ্রয়-বঞ্চিত লক্ষ্মণ এক্ষণে তোমারই আশ্রিত। হে লক্ষ্মণের একমাত্র উপাস্য রামচন্দ্র! তোমার চরণারবিন্দে সেবক লক্ষ্মণ শেষ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতেছে। আর্য্য ভরত! দেখ তুমি—দেখ দেখ—রঘু-কুল-পঙ্কজ-রবি ঐ জাগরিত হইতেছেন।"

এই বলিয়া মৃতকল্প লক্ষ্মণ, ভক্তিভরে রাম-চরণ

লক্ষ্য করিয়া, প্রণাম করিলেন এবং, কোন কথার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া, বিনা বাক্যে, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ প্রস্থান করিবার সমসময়েই রামচন্দ্র নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মৃত্যু হয় নাই; এখনও অভাগা রামের জীবন বিগত হয় নাই। লক্ষ্মণরূপ হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত হইয়াছে, তথাপি রামের চৈতন্য এককালে লোপ পায় নাই। রাম-হৃদয়! তুই বস্তুতই অত্যদ্ভুতের একশেষ। লক্ষ্মণ-বর্জ্জন করিয়া যে মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিতে পারে, সে রাম অতুলনীয় কীর্ত্তিমান্ সন্দেহ নাই!"

তদনন্তর ভরতের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মণ চলিয়া গিয়াছে! ভাই হে! দেখিতেছ না তুমি, রঘু-পুর অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণ প্রস্থান করিয়াছে। যে লক্ষ্মণ রামের জীবন, যে লক্ষ্মণ রামের অন্তরাত্মা, সেই লক্ষ্মণ প্রস্থান করিয়াছে; সুতরাং রাম তো জীবন-হীন হইয়াছে। তুমি যাও ভাই, দেখ আমার লক্ষ্মণ এতক্ষণ কত দূরে গেল— কোথায় গেল? না না, বাৎসল্যের অসদৃশ আধার সেই প্রিয়-তম ভ্রাতা নিশ্চয়ই এখনও দূরে যায় নাই। আমার হৃৎপিণ্ড

ছিন্ন করিয়া, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া, এবং আমাকে হত্যা করিয়া, সে কি কখন পলায়ন করিতে পারে? তাহাকে বর্জ্জন করিয়া আমার কি দশা উপস্থিত হয়, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত, পরম প্রেমিক লক্ষ্মণ, নিশ্চয়ই কক্ষান্তরে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে ডাক ভাই! যাও ভাই—তাহাকে ডাক ভাই! তাহাকে বল, রে লক্ষ্মণ! যদি পিতৃতুল্য মাননীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিতে তোর ইচ্ছা না হয়, যদি চিরদিন সম্পূজিত অগ্রজের প্রাণনাশ করিতে তুই সমুদ্যত না হইয়া থাকিস্, যাঁহার আদেশ-পালনে তুই চিরানুরত, যদি তাঁহার আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে তোর প্রবৃত্তি না হইয়া থাকে; যদি স্বহস্তে, স্বেচ্ছায় রামের হৃদয়ে শেলাঘাত করিতে তোর প্রবৃত্তি না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, রে স্নেহভাজন লক্ষ্মণ! একবার তুই ফিরিয়া আয়! একবার আসিয়া দেখিয়া যা, তোর বিরহে, ত্বদ্গত-প্রাণ অগ্রজ কীদৃশ বিজাতীয় যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছেন। প্রাণ যায়! রে প্রাণের লক্ষ্মণ! বারেক ফিরিয়া আসিয়া এ যন্ত্রণার শান্তি করিয়া দে! তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিও ভরত। সে নিতান্ত কোমল-হৃদয়, যৎপরোনাস্তি করুণা-প্রবণ, একান্ত বাৎসল্যানুগত। আমার এই যন্ত্রণার কথা তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, সে ধাবিত হইয়া আমার নিকটস্থ হইবে এবং আমার এই সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি সঞ্চারিত করিবে। তাহার সেই চন্দ্র-বদন চুম্বন করিলেই, আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। অতএব ভাই ভরত! অবিলম্বে আমার লক্ষ্মণের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আন। না ভাই! আমি স্বয়ংই তাহার সন্ধানে যাত্রা করিতেছি। আমি তাহাকে

উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছি। আমার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইলে, সে তৎক্ষণাৎ সাশ্রুনয়নে সমাগত হইয়া, আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিবে এবং, তখন এই নিষ্করুণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া, না জানি তাহার কতই আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইবে। লক্ষ্মণ রে! রে রামজীবন লক্ষ্মণ! রে প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণ! রে নয়ন-মণি লক্ষ্মণ! রে সর্ব্বস্বধন লক্ষ্মণ——"

এইরূপে লক্ষ্মণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে, রামচন্দ্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"হে রঘুনাথ! মোহ পরিহার করিয়া, জ্ঞান-নয়ন উন্মীলন কর; অনর্থক শোকের বশবর্ত্তী না হইয়া, কর্ত্তব্য সাধনে নিবিষ্ট-চিত্ত হও। তুমি বিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং সুধীরগণের চূড়ামণি। আজি তোমার এতাদৃশ অস্থৈর্য্য দর্শন করিয়া, জন-সমাজ কি মনে করিবে? কোথায় লক্ষ্মণ? তুমি মোহান্ধ হইয়া কাহার সন্ধান করিতেছ? স্মরণ করিয়া দেখ, সত্যানুরোধে তুমি সম্প্রতি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন করিয়াছ। সেই চির-সত্য-ব্রত, ধার্ম্মিকোত্তম, স্থিরধীঃ লক্ষ্মণের সহিত ইহ জগতে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করা নিরতিশয় বিড়ম্বনা। লক্ষ্মণের সহিত তোমার আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। অতঃপর মহারাজ! চিত্ত স্থির করিয়া বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট হও। চপল-চিত্ত সামান্য মানবের ন্যায়, শোকোন্মত্ত হওয়া সীতাপতির শোভা পায় না।"

তখন রামচন্দ্র বলিলেন,—"অহো! সত্যানুরোধে আমি পরম গুণময় লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছি। সেই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি সত্যপ্রিয় লক্ষ্মণ, ধর্ম্মানুরোধে বর্জ্জন-বজ্র মস্তকে ধারণ

করিয়াছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই নিদারুণ শোকে এতক্ষণ তাহার প্রাণান্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ নাই! রে ভরত! লক্ষ্মণ আর নাই! কিন্তু লক্ষ্মণ-হীন রাম এখনও রাজ-প্রাসাদে সজীব অবস্থায় বিচরণ করিতেছে! হে গুরো! রাম-বর্জ্জিত লক্ষ্মণের নিশ্চয়ই জীবনান্ত হইয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মণ-হীন রাম, এখনও আত্মীয়-মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া, সেই দারুণ দুর্দ্দৈবের আলোচনা করিতেছে। হা বিধাতঃ! কোমল-প্রাণ লক্ষ্মণ বিনাশের আয়ুধ তুমি সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার সে মরণায়ুধ এ পাষাণ-হৃদয় রামের প্রাণান্ত-সাধনে সক্ষম নয়। রে মৃত্যু! লক্ষ্মণ-হীন রাম আর কতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিবে? রে লক্ষ্মণ! তুই চিরদিন ছায়ার ন্যায় রামের অনুগামী। আজি ভাই একবার রামকে তোর অনুগামী হইতে দে। তুই যে রাজ্যে গমন করিয়াছিস্, রামকেও সেই রাজ্যে লইয়া চল্।"

কুশীলব, পিতার এইরূপ শোক-বিকল অবস্থা দেখিয়া, আর্ত্ত স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই রোদন-ধ্বনি কর্ণগোচর হইলে, রামচন্দ্র নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া, বারংবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"ঐ লক্ষ্মণের কণ্ঠ-স্বর, ঐ লক্ষ্মণের রোদন-ধ্বনি। আমার সেই প্রেমময় লক্ষ্মণ এখানেই লুকাইয়া আছে। তাহার কণ্ঠ-স্বর—তাহার রোদন-ধ্বনি আমার কর্ণে সুপরিচিত। সে, অন্তরালে লুকাইয়া, এই পাষাণ রামের দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিতেছে। কৈ লক্ষ্মণ! কোথায় লক্ষ্মণ! আয় ভাই! দেখা দে ভাই! এই মরণ-কালে তোর মাধুর্য্য-ময়ী মোহনী মূর্ত্তি একবার আমায় দেখিতে দে ভাই!"

অতঃপর শোকোন্মত্ত রামচন্দ্র, সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, অবনী-পৃষ্ঠে শয়ান হইলেন। তখন বিকল-হৃদয় ভরত. বশিষ্ঠ দেবকে লক্ষ্য করিয়া, বলিলেন,—"হে কুল-গুরো বশিষ্ঠদেব! বোধ হয় অদ্য আমাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়েরই জীবনের শেষ দিন উপস্থিত। যে মুহূর্ত্তে শ্রবণ করিয়াছি যে, অনৈক অপরিচিত তপস্বী; মহারাজ রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে, নির্জ্জনে বাক্যালাপ করিতেছেন এবং পূজ্যপাদ আর্য্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যে, তৎকালে যে কেহ তাঁহার সমীপাগত হইবে, তাহাকেই তিনি বর্জ্জন করিবেন, তখনই দারুণ ভয়ে অবসন্ন-হৃদয় হইয়া, নিতান্ত অশুভ পরিণামের অপেক্ষা করিতেছিলাম। তদনন্তর যখন শুনিয়াছি, পরম প্রীতিভাজন লক্ষ্মণ, উগ্রতপা দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত-ভয়ে, অগত্যা রামের সেই নিভৃত নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, আজি সত্য-পরায়ণ রামচন্দ্র নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ-বর্জ্জন-রূপ দুষ্কর ক্রিয়া সাধিত করিবেন; তখনই বুঝিয়াছি, প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়া, রঘুনাথ কদাপি প্রাণ-ধারণে সক্ষম হইবেন না; তখনই বুঝিয়াছি, প্রেমময় রামচন্দ্রের প্রিয়ানুজগণও, তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাঁহার অনুগামী না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। হে গুরো! অতঃপর রামচন্দ্রকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনর্থক। যে নিদারুণ শেল অদ্য তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে, তাহার আঘাত প্রশমিত করিতে পারে, সংসারে এরূপ কোন ঔষধ নাই; যে অবক্তব্য যাতনায় অদ্য তাঁহার অন্তর প্রপীড়িত হইতেছে, মৃত্যু ভিন্ন তাহার আর শান্তি নাই। অতএব, অদ্য রঘুনাথের, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেরও, জীবনেরও শেষ দিন উপস্থিত। হা অপরিচিত ও অজ্ঞাত-নামা ঋষিরাজ! এইরূপ দারুণ বিষময়

ফলোৎপাদনের জন্যই কি অদ্য তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল? বাঙ্‌নিষ্ঠ ও সত্যময় রামচন্দ্রাদিকে এইরূপ অসহনীয় মর্ম্মপীড়া দিতেই কি তোমার আগমন ঘটিয়াছিল? এইরূপে এক-প্রাণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিনাশ সাধন করিতেই কি রঘু-রাজ-পুরে তোমার পদার্পণ হইয়াছিল? হায়! রে লক্ষ্মণ! এতক্ষণ তোর তাপিত প্রাণ দেহে আছে কি না সন্দেহ। রাম-পরিত্যক্ত হইয়া, তোর তাপিত প্রাণ তিলেকের নিমিত্তও দেহাশ্রয়ে থাকিবে, বোধ হয় না। কিন্তু রে ভাই! অধুনা রাম-বর্জ্জিত হইলেও, তোর জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে। তুই আর্য্যের চির-সঙ্গী ও চিরানুগত সেবক। রণে বা বনে, বিপদে বা সম্পদে, সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই তুই রামের পার্শ্বচর, সুতরাং রে ভ্রাতঃ! রাম-রঞ্জন ও রাম-পরিচর্য্যা-রূপ অপার্থিব সুখ তুই যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছিস্। কিন্তু এ অভাগা ও শত্রুঘ্ন এখনও রাম-সেবায় অতৃপ্ত। হায়! এই অবস্থাতেই আমাদের রামের পশ্চাদ্গামী হইতে হইতেছে; সুতরাং রঘুনাথের চরণ-সেবা-রূপ পরম সুখের সুযোগ আর আমা-দের দুরদৃষ্টে ইহ জগতে সঙ্ঘটিত হইবে না। মৃত্যুর জন্য এ তাপিত ভরত তিলমাত্র ব্যাকুল নহে; কিন্তু রামচরণাম্বুজ সেবার আর অধিকার থাকিবে কি না, ইহাই অধুনা যৎ-পরোনাস্তি চিন্তার কারণ। রে শত্রুঘ্ন! এই দারুণ বজ্র হয়ত এখনও তোর শিরে নিপতিত হয় নাই। মৎ-প্রেরিত দূত এতক্ষণও হয়ত তোর সমীপস্থ হয় নাই; শিয়রে বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হয়ত এখনও তুই জানিতে পারিস্ নাই। রে বৎস! আমাদের সক-লেরই কাল পূর্ণ হইয়াছে। এ বিষম ব্যাপারে আত্ম-সমর্পণ

করিয়া, তুইই কি স্থির থাকিতে পারিবি? অহো কঠোর নিয়তি!"

ভরত যখন এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, তখন রামচন্দ্রের চৈতন্যাবির্ভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভরত বলিলেন,—"দেখুন, দেখুন গুরো! আর্য্যের পুনরায় জ্ঞানোদয় হইতেছে। আমি অবসন্ন, মর্ম্মাহত এবং প্রপীড়িত হইয়াছি। আমার দ্বারা প্রভুর বিনোদন এক্ষণে অসম্ভব। ভগবন্! আপনারা রঘুনাথের শুশ্রূষায় মনোযোগী হইয়া, এ অধমকে কৃতার্থ করুন।"

এদিকে বিকল-হৃদয় রামচন্দ্র, নয়ন উন্মীলন করিয়া, বলিলেন,—"হা পিতঃ দশরথ! তোমার অতি-যত্ন-পালিত পরম-স্নেহ-ভাজন রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপে জীবনাবসান হইবে, এ কথা তুমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই। আজি তোমার জ্যেষ্ঠ নন্দন, স্বহস্তে কনিষ্ঠ-নিপাত করিয়া, আত্ম-হত্যার আয়োজন করিতেছে। যে চণ্ডালাধম রামকে তোমরা সতত ধার্ম্মিকোত্তম ও পরমগুণবান্ বলিয়া সমাদর করিতে, সেই নারকী রাম, স্ত্রী-হত্যা-রূপ মহাপাপে পরিতৃপ্ত না হইয়া, অধুনা জ্ঞানতঃ ভ্রাতৃ-নিপাত-রূপ ঘোর পাতকানুষ্ঠানও করিয়াছে। অহো! পুণ্যময় লক্ষ্মণ এতক্ষণ, তোমাদের সমীপস্থ হইয়া, দিব্যলোকের অধিবাসী হইয়াছে। এ পাপাধম রামের অপরিসীম দুষ্কৃতি-কলাপ সন্দর্শনে, বিরক্ত-চিত্ত হইয়াই, তাহার সাহচর্য্য হইতে তোমরা লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিয়া, রামের প্রতি তোমাদের নিদারুণ নিগ্রহ পরিব্যক্ত করিয়াছ। অয়ি মাতঃ কৌশল্যে! মাতঃ কেকয়ি! মাতঃ সুমিত্রে! অদ্য তোমাদের পরম-স্নেহাস্পদ, সর্ব্বগুণে গুণবান্ নয়ন-বিনোদন নন্দন লক্ষ্মণ তোমাদের শান্তি-ময় ও সুখময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ঐ যে—ঐ যে আমার প্রাণ-প্রতিম লক্ষ্মণ তোমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। ঐ যে তোমরা স্নেহ-ভরে কেহ বা তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিতেছ, কেহ বা তাহার সুকোমল কলেবরে হস্তাবমর্ষণ করিতেছ, কেহ বা তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছ। কিন্তু একি দেবি! তোমরা এ অধম রামের প্রতি এরূপ নিষ্করুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছ কেন? ওকি! রাম যে তোমাদের বাৎসল্যা-কাঙ্ক্ষী; তাহার প্রতি তোমরা ওরূপ ক্রোধ-কঠোর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ কেন? না না। অয়ি মাতৃকে! লক্ষ্মণকে আমি আর তোমাদের কক্ষচ্যুত করিয়া গ্রহণ করিব না। লক্ষ্মণ তোমাদেরই ধন। আমি তাহাকে এক একবার দেখিবার প্রার্থনা করিমাত্র। না না, তোমরা আমার এ সৃষ্টি-সংহারক আত্মীয়-বিনাশক দৃষ্টি লক্ষ্মণের উপর নিপতিত হইতে দিবে না? তবে কাজ নাই। তোমরা শান্ত হও। তোমাদের নিষ্কারুণ্য এ নারকী রামের চির-নিরয় নিবাসের নিদান। লক্ষ্মণ, তোমাদের স্নেহ-তরু-তলে অবস্থিত থাকিয়াই, চির-শান্তি সম্ভোগ করুক, আমি আর কদাপি, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তোমাদের বিরাগ-ভাজন হইব না।

"ও কে? পার্শ্বে সর্ব্বসুষমাময়ী মৃদু-মধুর-হাস্যমুখী, কে ও দিব্যাঙ্গনা? চিনিয়াছি—চিনিয়াছি—সুন্দরি! তুমি এ অভাগা রামের হৃদয়-সর্ব্বস্ব জানকী। আইস দেবি! আইস শুভে! বড় দুঃসময়ে তুমি দর্শন দিয়াছ। অয়ি জানকি! আজি রামের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আজি তোর আদরের লক্ষ্মণ রামের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। একি, একি সীতে! তুই এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহতবৎ ভূতল-

শায়িনী হইলি না? লক্ষ্মণের তিরোধান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তোর সংজ্ঞা তিরোহিত হইল না? ও কি! ও কি পাষাণময়ি! তোর বদন-মণ্ডল আহ্লাদে উৎফুল্ল; তোর নয়ন-যুগল আনন্দ-জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত; তোর অধরৌষ্ঠ হাস্য হেতু বিভিন্ন। অহো! বুঝিয়াছি। করুণাকণা-বিবর্জ্জিতে অয়ি সীতে! তোমার স্নেহের লক্ষ্মণ এক্ষণে তোমারই পার্শ্বচর; তাই তোমার এত আনন্দ। রে পাষাণি! রে হৃদয়-হীনে! আজি রামের অবক্তব্য যাতনা সন্দর্শনে তোর আনন্দের পরিসীমা নাই। যে রাম বিনা অপ-রাধে তোমাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিল, যে রাম তোমার পাষাণ-দ্রবকর করুণোক্তি শ্রবণ করিয়াও, তোমার প্রতি তিল-মাত্র কৃপা প্রকাশ করে নাই; যে রাম চক্ষুঃ-সমক্ষে তোমাকে লোকান্তর-গতা হইতে দেখিয়াও, কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হয় নাই, সেই বজ্র-হৃদয় রামকে অদ্য এইরূপ যাতনানলে বিদগ্ধ হইতে দেখিয়া, তোমার প্রতিহিংসা-পরায়ণ হৃদয়ের বিশেষ সন্তোষ জন্মিতেছে। অয়ি পতিব্রতে! আমি তোমাকে চির-দিন যেরূপ যাতনানলে দগ্ধীভূতা করিয়াছি, তোমাকে নিতান্ত নিরপরাধিনী জানিয়াও, নিয়ত তোমাকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, এতদিন পরে বিধাতা তাহার অনুরূপ শাস্তির বিধান করিয়াছেন। এক্ষণে হে দেবি! তুমি অনুকম্পা সহকারে এ চির ভাগ্য-হীন রামকে ক্ষমা কর। তোমার ক্রোধ শান্তি না হইলে, আমার যাতনার অবসান হইবে না। অয়ি গুণবতি! ত্বরায় যাহাতে আমার মৃত্যু হয়, তাহা-রই ব্যবস্থা কর। হউক তোমার সন্তোষ—হউক তোমার আনন্দ; রাম তাহাতে আর প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে না। কিন্তু একদা যে রামকে তুমি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে,

যে রামকে তুমি পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করিতে, যে রামের প্রিয় কার্য্য সাধনই তোমার প্রধান ব্রত ছিল, অদ্য হে দেবি! সেই রামের একমাত্র অনুরোধ তুমি রক্ষা করিবে কি? তুমি তোমার অনুগত লক্ষ্মণকে একবার কৃপা করিয়া বলিও, সে যেন এক একবার রামকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করে। তাহার অদর্শনে আমার যে যন্ত্রণা হইতেছে, ইহ জগতে তাহার আর তুলনা নাই। যতক্ষণ আমার মৃত্যু না হয়—জানি না কত দিনে এ পাষাণ-প্রাণ রামের দেহ হইতে প্রাণবায়ু তিরোহিত হইবে—যতদিন আমার মৃত্যু না হয়, ততদিন আমি এক একবার লক্ষ্মণের চন্দ্রবদন সন্দর্শনের ভিখারী। তোমার লক্ষ্মণকে, তুমি অনুরোধ করিলে, সে নিশ্চয়ই আমাকে এই ভিক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিবে।"

তদনন্তর কিয়ৎকাল করজোড়ে ঊর্দ্ধনেত্র থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"এতক্ষণে, হে চির-প্রেমময়ি! এতক্ষণে তোমার আনন্দের কারণ জানিতে পারিয়াছি। অদ্য আমাদের সুদীর্ঘ বিরহ-বেদনার অবসান হইবে—অদ্য, বহুকাল পরে, তোমার সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হইবে; এই জন্যই অয়ি সাধ্বি! তোমার বদন-কমলে সুবিমল আনন্দ-রশ্মি প্রদীপ্ত; কিন্তু মুগ্ধে! কতক্ষণে এ যাতনা-পূর্ণ রাম-জীবনের পরি-সমাপ্তি হইবে? এ অসহনীয়া যাতনা রামকে আর কতক্ষণ ভোগ করিতে হইবে?"

তখন বশিষ্ঠদেব রামের শোক-প্রবাহে বাধা দিয়া বলিলেন,—"হে চির-কর্ত্তব্য-পরায়ণ রামচন্দ্র! কেন তুমি আজি অনর্থক শোকের বশবর্ত্তী হইয়া যৎপরোনাস্তি অনর্থপাতের

সূচনা করিতেছ? কেন তুমি আজি তোমার চির-সহায় ধৈর্য্যের সহায়তা গ্রহণ না করিয়া, নানা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা ঘটাইতেছ? লক্ষ্মণ-বর্জ্জন তোমার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়াছিল। তুমি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাধু-সম্মত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, শোকোন্মত্ত হইলে, লোকে, তোমার দৃঢ়তার অভাব দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। প্রজালোকে, তোমাদিগকে এবংবিধ দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়াছে। অযোধ্যাবাসী জানপদবর্গ, শঙ্কাকুল-চিত্ত হইয়া, অতি ক্লিষ্ট হইতেছে। রাজ্যের সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। রাজ্যস্থ যাবতীয় নর-নারী নিদারুণ শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে। রাজ্যের এরূপ দশা আর কিয়ৎকালমাত্র থাকিতে দিলে, সুপ্রতিষ্ঠিত রঘুরাজ্য অনতিকাল মধ্যেই উৎসন্ন-দশা প্রাপ্ত হইবে। হে প্রজানুরক্ত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ মহারাজ! তুমি যদি শান্ত-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজা-পালনে মনোযোগী না হও; যদি ধৈর্য্য বলে, হৃদয়-নিহিত শোকাবেগ বিদূরিত করিয়া, কর্ত্তব্য-সেবায় নিবিষ্ট-চিত্ত না হও, তাহা হইলে, হে রামচন্দ্র! ইহ লোকে তোমার কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না; এবং পরলোকেও তোমার অধোগতির ইয়ত্তা থাকিবে না। ধৈর্য্যই ধর্ম্মাত্মার চির-সহায়। আমি অনুরোধ করিতেছি, তুমি, অতীত ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া, অনতিকাল-মধ্যে প্রজা-পালনে মনঃসংযোগ কর।"

রামচন্দ্র, বশিষ্ঠদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎকাল অধোবদনে চিন্তা করিলেন। তদনন্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ধরা-ধাম হইতে ও মনুষ্য-সমাজ হইতে মহা-প্রস্থানের পূর্ব্বে, প্রজা-পালনের সুব্যবস্থা করা আমার পক্ষে

নিতান্ত আবশ্যক। হে ভগবন্! এ অন্তিম সময়েও ধর্ম্ম-রক্ষায় জ্ঞানতঃ বিমুখ হইব না। অতএব আমি সম্প্রতি সর্ব্বাগ্রে প্রজাপালনের ব্যবস্থাতেই প্রবৃত্ত হইব।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে লক্ষ্মণ অসাধারণ ধৈর্য্য ও অমানুষী দৃঢ়তা সহকারে রামের সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং, রামকে চলচ্চিত্ত দেখিয়া, তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পালনে সমুত্তেজিত করিতেছিলেন, সেই লক্ষ্মণ রামের সঙ্গ-শূন্য হইয়া রাজ-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, উন্মত্তবৎ অস্থির ও বাহ্য-জ্ঞান-বিহীন হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার চক্ষে সংসার অন্ধকার, জগৎ শূন্য এবং বসুধা অরণ্যানী-বৎ প্রতীত হইতে লাগিল। তখন তিনি সংজ্ঞা-শূন্য, বিবেক-বিহীন ও কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ়। তখন তাঁহার নয়নে জল নাই, নাসায় দীর্ঘশ্বাস নাই এবং বদনে হাহাকার রব নাই। তখন তাঁহার কলেবর নিস্তেজ, হৃদয় অচল এবং অন্তর ক্রিয়াহীন। মৃতবৎ লক্ষ্মণের তখন চলচ্ছক্তি নাই, দর্শন শক্তি নাই এবং অনুভব শক্তি নাই। এইরূপ মৃতকল্প লক্ষ্মণ পুরান্তরের ভিত্তি-বিশেষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, জীবন-বিহীন পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে আলুলায়িত-কুন্তলা, বিগলিত-বসনা, রোরুদ্যমানা এক পরমাসুন্দরী নক্ষত্রবৎ বেগে লক্ষ্মণের

সমীপাগতা হইলেন এবং তাঁহার চরণ-সমীপে নিপতিতা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে হৃদয়-দেবতা! হে আনন্দ-নিকেতন! হে সর্ব্ব-গুণময়! তোমার এ সেবিকা ঊর্ম্মিলাকে পরিত্যাগ করিয়া, আজি তুমি কোথায় যাইতেছ? হে মহাপুরুষ! অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় অদ্য তুমি রঘু-কুল-তিলক জ্যেষ্ঠ আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ। কিন্তু গুণময়! তোমার এ দাসীকে ছাড়িয়া, তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমারও যে পথ এবং যে গতি, তোমার এ কিঙ্করীরও সেই পথ ও সেই গতি। তবে কেন দেবতা! তুমি তোমার এ সেবিকাকে সঙ্গে লইবার কল্পনা করিতেছ না? কেন তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত করিবার উদ্যোগ করিতেছ? দাসী তোমার এই সর্ব্ব-সুখাধার পাদপদ্ম কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। আমাকে পরিত্যাগ করা যদি তোমার সঙ্কল্পানুকুল হয়, তাহা হইলে হে মেঘনাদ-হন্তঃ! অগ্রে স্ত্রী-হত্যা না করিলে, তাহার পথ পরিষ্কার হইবে না।"

এতক্ষণে লক্ষ্মণের চৈতন্য জন্মিল। তখন তিনি ঊর্ম্মিলার বদন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"অহো ঊর্ম্মিলে! রামচন্দ্র অদ্য আমাকে বর্জ্জন করিয়াছেন; সুতরাং আমার মৃত্যু হইয়াছে। এ দারুণ বজ্র-বার্ত্তা তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে কি? অয়ি সুন্দরি! তুমি এক্ষণে বিধবা হইয়াছ। যাও সাধ্বি, বিধবোচিত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও। ইহ সংসারে আমার আর কর্ত্তব্য-বন্ধন নাই; এ মৃত লক্ষ্মণ আর কোন প্রকার মায়ামোহাদিতে অভিভূত হইবে না। কিন্তু অয়ি পতি-হীনে! তোমার কর্ত্তব্যের এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। তুমি লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী; সুতরাং লক্ষ্মণের যাহা

কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, তোমারও তাহাই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।" ইহ জগতে রাম-সেবাই লক্ষ্মণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ও একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু নিদারুণ বিধাতৃ-নিগ্রহে, লক্ষ্মণ সেই সুখপ্রদ কর্ত্তব্য সাধনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বঞ্চিত হইয়াছে। তুমি পরমপুণ্যবতী ও নিতান্ত ভাগ্যবতী বলিয়া, সেই সারধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ভার অতঃপর তোমারই হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। এরূপ পুণ্য-সঞ্চয়ের সুযোগ তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিতে, তোমার অন্য চিন্তা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাও শুভে! সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সর্ব্বগুণময় রামচন্দ্রের সেবা ও তাঁহার প্রসাদন করিয়া, অনন্ত ঊর্দ্ধগতির উপায় উদ্ভাবন কর। এ লক্ষ্মণের নাম তুমি আর স্মরণ করিও না; এ লক্ষ্মণের মূর্ত্তি অন্তর-প্রদেশ হইতে বিদূরিত করিয়া দেও। কে সে লক্ষ্মণ? অতি ক্ষুদ্র এক বালুকা-কণামাত্র। আর কে সে রামচন্দ্র? হিমাদ্রির ন্যায় গুণ-গৌরব-সম্পন্ন মহাপুরুষ। অহো অভাগা লক্ষ্মণ, সেবা করা দূরে থাক, তাঁহার চরণ দর্শনেরও আর অধিকারী নহে!"

লক্ষ্মণের চরণাশ্রিতা ঊর্ম্মিলা বলিলেন,—"হে পরম-দেবতা! লোকাভিরাম রামচন্দ্রের চরণযুগলের অর্চ্চনা যখন তোমার প্রিয়কার্য্য, তখন যে তোমার দাসীরও তাহাই সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু হে স্বামিন্! ভবদীয় জীবন ব্যতীত, ঊর্ম্মিলার তো স্বতন্ত্র জীবন নাই। তুমি যদি রাম-পরিত্যক্ত হইয়া জীবন-বিহীন হইয়া থাক, তোমার এ সেবিকাও সুতরাং রাম-পরিত্যক্তা ও গতজীবনা হইয়াছে। অতএব রঘু-কুল-রবি রামচন্দ্রের চরণ-সেবায় এ দাসীরই আর অধিকার কোথায়? হে দয়াময়! আপনি

আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি, অন্য কোন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, ভবদীয় চরণ পরিত্যাগ করিয়া, কদাপি কাল। গমন করিব না। হে অভাগিনীর হৃদয়-সর্ব্বস্ব! আ ভাবতেই প্রতি নিষ্করুণ হইবেন না; নিরপরাধে আরতে, ধাবিত করিবেন না।” চিরকাল মধ্যে

তখন লক্ষ্মণ বলিলেন,—“অয়ি ভদ্রে! সহিত অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করিয়া, কেন করিয়া, নিতান্ত করিতেছ? তোমাকে বর্জ্জন বা গ্রহণ করি “হে রামরাজ্যের কোনই অধিকার নাই। জান না তুমি, লক্ষ্মণক, অদ্য অভাগা রাম-পরিত্যক্ত লক্ষ্মণের জীবন জগতে ক্রিয় কাতর লক্ষ্মণ— এরূপ পতিত লক্ষণ, স্ত্রী বা পুত্র, আত্মীয়দের নিকট হইতে, প্রতি মমতা প্রকাশ করিতে অক্ষম ও অত্যক্ত লক্ষ্মণ এখনও জন্য অতিপ্রীতিজনক কর্ত্তব্যের পন্থা বিস্ময়াবহ ব্যাপার। সেই সুমহৎ-কর্ত্তব্যানুসরণ করিয়া, ও অবিদিত নাই। তুমি ধন্যা ও সম্মানিতা হইবে। ক ব্যাপারের পরেও, তোমার পালনীয় পবিত্র পন্থায় বিচর বক্ষে ধারণ করিয়া, পুঞ্জ অর্জ্জন করিতে থাক। এ অভাগা বদ্ধ হইয়া যে লক্ষ্মণ কেহ নহে। আমি রাম-পরিত্যক্ত—ল অনশনে থাকিয়াও, ভিখারী। তুমি দেখিতেছ না শুধে লক্ষ্মণ হয়ত অমর। সন্নিকটে গমন করিবার অধিকা কদাপি তাহার জীবিত আর সন্দর্শন করার সম্ভাবনা না শেল? কোথায় বা নাগ- আর কর্ণগোচর হইবার উপ আমার বক্ষে নিপতিত হউক, আছে কি? অহো! ভাগ্যহী কে নিবদ্ধ করুক, শত শত এখনও জীবিত আছিস্? রে ল আমার শিরে সম্পাতিত কুসুম-কোমল-কলেবর আর তোর না করিতে সক্ষম। কিন্তু

্ই, তবে তুই আর আছিস্ কেন? না—
রাম-ে প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হ
কিন্তু নিদ্র-কি উর্ম্মিলা? উ গমন-
ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রদান ্ঠস্বর কখন
নিতান্ত ভাগ্যবত কখন দেখিয়াছ
অতঃপর তোমার ়ই ঘটিয়াছিল। আমি
সুযোগ তোমার স ্রত তাঁহার পরিচর্য্যা করাই
করিবার কোনই ্তত সেই মহাপুরুষের অনুগামী
সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার সে সকল
প্রসাদন করিয়া, আ হইয়াছে। তথাপি আমার মৃত্যু হয়
লক্ষ্মণের নাম তুমি চর্য্য কথা কখন কোথাও শুনিয়াছ
অন্তর-প্রদেশ হইতে ছ কি? ঐ রামচন্দ্র মধুবর্ষী কণ্ঠে কথা
অতি ক্ষুদ্র এক বা নিতে পাইতেছ কি? ঐ যে, শুন শুন—
হিমাদ্রির ন্যায় গুণ-শ্রবণ কর! আহা হা! কি মধুর! কি
লক্ষ্মণ, সেবা করা দূ ঐ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া—ঐ দূরাগত
অধিকারী নহে।" আমি ধাবিত হই। ঐ বুঝি রামচন্দ্র,
লক্ষ্মণের চরণাশ্রিত আমাকেই প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছেন।
দেবতা! লোকাভিরাম র
তোমার প্রিয়কার্য্য, তখন দৃষ্টিপাত না করিয়া, বেগে ধাবিত
প্রধান কর্ত্তব্য, তাহার আর ধ্য, বাতুলতুল্য বিকলভাবে, রাজ-
ভবদীয় জীবন ব্যতীত, উর্ম্মিলা দেবী, তাঁহার অনুসরণ করিতে
তুমি যদি রাম-পরিত্যক্ত হ হইলেন এবং অধোমুখে রোদন
তোমার এ সেবিকাও সুতরাং
হইয়াছে। অতএব রঘু-কুলদারুণ দুঃখ-জনক লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের
দাসীরই আর অধিকার রয়াছিল। এক্ষণে রাম-পরিত্যক্ত

লক্ষ্মণকে পথিমধ্যে,তাদৃশ অবস্থায়, দর্শন করিয়া,নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, হাহারবে ক্রমশঃ লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিতে লাগিল। চারুশীলা অন্তঃপুরিকা এবং অপোগণ্ড শিশু পর্য্যন্ত, তাবতেই লক্ষ্মণকে দেখিবার নিমিত্ত, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, ধাবিত হইতে লাগিল। আনন্দ-পূর্ণ অযোধ্যা-ভুবন অচিরকাল মধ্যে শোকের কোলাহলে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

তখন শোকোন্মত্ত লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, নিতান্ত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—"হে রামরাজ্যের সৌভাগ্যবান্ প্রজাবৃন্দ! তোমরা শুনিয়াছ কি, অদ্য অভাগা লক্ষ্মণকে গুণময় রামচন্দ্র বর্জ্জন করিয়াছেন। কাতর লক্ষ্মণ—তোমাদের প্রেমমুগ্ধ লক্ষ্মণ, অদ্য তোমাদের নিকট হইতে, চির-বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। রাম-পরিত্যক্ত লক্ষ্মণ এখনও জীবিত আছে, ইহা বস্তুতই যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবহ ব্যাপার। কিন্তু লক্ষ্মণ নিতান্ত কঠিন-প্রাণ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই জন্যই লক্ষ্মণের প্রাণ, এই মর্ম্মবিদারক ব্যাপারের পরেও, দেহাশ্রয় ত্যাগ করে নাই। শক্তিশেল বক্ষে ধারণ করিয়া, যে লক্ষ্মণ জীবন-হীন হয় নাই, নাগ-পাশে বদ্ধ হইয়া যে লক্ষ্মণ কাল-গ্রাসে পতিত হয় নাই, সুদীর্ঘ কাল অনশনে থাকিয়াও, যে লক্ষ্মণের প্রাণান্ত ঘটে নাই, সে লক্ষ্মণ হয়ত অমর। অমর হইলেও, রাম-পরিত্যক্ত হইয়া কদাপি তাহার জীবিত থাকা সম্ভব নহে। কোথায় শক্তিশেল? কোথায় বা নাগপাশ? শত শত শক্তিশেল সহসা আমার বক্ষে নিপতিত হউক, শত শত নাগপাশ নিরন্তর আমাকে নিবদ্ধ করুক, শত শত বজ্র, নভস্তল বিদীর্ণ করিয়া, আমার শিরে সম্পাতিত হউক, সে সকলও হয়ত আমি সহ্য করিতে সক্ষম। কিন্তু

এ দারুণ ব্যথা—এ অসহনীয় যন্ত্রণা, রে লক্ষ্মণ! তুই কেমন করিয়া এখনও সহিতেছিস্? কিন্তু প্রাণ আছে বলিয়াই এখনও লক্ষ্মণের রসনা পুনঃ পুনঃ রঘুনাথের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছে; এখনও লক্ষ্মণের চিত্ত অবিরত সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মহাপুরুষের প্রশান্ত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারিতেছে। কিন্তু রে লক্ষ্মণ-নয়ন! তুইতো আর রামের সেই সর্ব্বসুখপ্রদ চরণ-যুগল দর্শন করিতে পাইতেছিস্ না। হে অযোধ্যাবাসি-গণ! তোমরা আমার এই অন্তিম সময়ে,একবার প্রভু রামচন্দ্রকে দেখাইতে পার না কি? তোমরা রামের প্রাণাধিক প্রিয় প্রজা। তোমরা ডাকিলে, সেই প্রজানুরক্ত মহারাজ অবশ্যই তোমাদের সম্মুখীন হইবেন। সেই সুযোগে, তোমাদের কৃপায়, এই অধম লক্ষ্মণও পুনরায় রামদর্শন করিয়া ধন্য হইবে। তোমরা লক্ষ্মণের প্রতি চির-কৃপাশীল। লক্ষ্মণ জ্ঞানতঃ তোমাদের ইষ্ট ভিন্ন কখন কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করে নাই। আজি তোমরা লক্ষ্মণের এই শেষ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া, তাহাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবে না কি? ঐ যে—ঐ যে—ঐ দিকে বহুতর লোক সমাগত হইতেছে। ঐ জনতার মধ্যে নিশ্চয়ই আমার পরম প্রভু আছেন। আমি ঐ দিকে গমন করিলে, এখনই রঘুনাথের দর্শন লাভ করিব। ভ্রাতৃগণ! ভগিনীগণ! বন্ধুগণ! মাতৃগণ! আমাকে বিদায় দেও। আমি রামদর্শনার্থ ধাবিত হইতেছি।”

এই বলিয়া উন্মাদ লক্ষ্মণ বেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। অযোধ্যাবাসিগণ, রোদন ও পরিতাপ করিতে করিতে, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর এইরূপে অগ্রসর হইয়া, লক্ষ্মণ, সহসা সম্মুখাগত ব্যক্তি-বিশেষের হস্ত ধারণ করিয়া,

জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি কি কখন রাম-দর্শন করিয়াছ? অহো! তুমি পরম সাধু। হে পুণ্যাত্মন্! হে ভাগ্যবন্। আমি সানুনয়ে তোমার সমীপে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে বলিয়া দেও, কীদৃশ সাধন করিলে এবং কীদৃশ সুকৃতি সঞ্চিত হইলে, রাম-দর্শনে স্থির অধিকারী হওয়া যায়।”

সে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। তখন লক্ষ্মণ সহসা নিতান্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন,—“আমি যাই। ভাই! আমাকে বিদায় দেও। রাম-দেহের অলৌকিক সুরভি-শ্বাস আমার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার দেহ ও মনকে নিতান্ত পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। নিশ্চয়ই সন্নিহিত প্রদেশের কোনস্থানে, সেই লোকাতীত-বাৎসল্য-পূর্ণ মহাত্মা, লুক্কায়িত থাকিয়া, আমার দুর্দ্দশা সন্দর্শনে, রোদন করিতেছেন। আমি যাই ভাই!”

পুনরায় লক্ষ্মণ বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। বহুদূর এইরূপে গমন করিয়া, লক্ষ্মণ সম্মুখে এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। হে চির-রক্ষণশীল ভূদেব! আপনি অসাধ্য-সাধনে সক্ষম। আপনি ইচ্ছাময় ও অন্তর্য্যামী। কৃপা করিয়া, হে ভগবন্! একবার সেই পদ্ম-পলাশলোচন রঘু-কুল-কেশরী রামচন্দ্রের পুণ্যময় কলেবর আমার নয়ন-সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, আমার জীবন রক্ষা করুন।”

তখন সেই রোরুদ্যমান বিপ্র, সস্নেহে ও সাদরে, লক্ষ্মণকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত করিলেন। লক্ষ্মণ, কিয়ৎকাল সোদ্বেগে তাঁহার বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন,—“না না—আপনিই না দুর্ব্বাসা? ক্ষমা করুন—প্রভো! অজ্ঞানের অপ-

রাধ ক্ষমা করুন। ভবদীয় আজ্ঞাধীন হইয়া, অসময়ে রামদর্শন করিয়াই আমার আজি এই দুর্দ্দশা। না ভগবন্! এ অধম সেবক আপনার নিকটে আর কোন প্রার্থনা করিতেছে না। আপনি ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট হইতে পলায়ন করি। সর্ব্বনাশ হইল—পলায়ন করি। আপনার জন্য রাম-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি; আবার কি রাম-রূপ-চিন্তনেও বঞ্চিত হইব?"

তখন লক্ষ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের বাহুপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, পুনরায় প্রমত্ত ভাবে প্রধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক পরিণতাবয়ব শ্যেন পক্ষী নয়ন-গোচর করিয়া, লক্ষ্মণ বিনয়নম্র ভাবে কহিলেন,—"হে বিহগবর! তুমি কি সম্পাতি-নন্দন সুপার্শ্বের বংশধর? যদি তাহা হও, তাহা হইলে, হে নভশ্চর! তোমাকে স্মরণ করাইতে হইবে না, যে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ রঘুকুলের চির-সহায় ও নিতান্ত হিতৈষী মিত্র। বিহগরাজ জটায়ু, বিপন্না জানকীর হিতকল্পে, জীবনদান করিয়াছিলেন। অমিত-প্রতাপ সুপার্শ্ব, লঙ্কেশ্বরের রথ-গ্রাস করিয়া, আমাদিগের উপকার সাধনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তুমি যদি সেই বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আমার অন্তিম প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে। হে বিহঙ্গম! তুমি শুনিয়াছ কি, আজি রঘুনাথ এ অধম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছেন। যতক্ষণ আমার প্রাণান্ত না হয়, ততক্ষণও সেই রঘুকুলপুঙ্গবের মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকা, আমার কল্পনাতীত যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। তুমি কৃপা করিয়া, তোমার ঐ বলিষ্ঠ পক্ষপুটে, রামচন্দ্রকে একবার যদি বহন করিয়া আন, তাহা হইলে আমি মরণকালে তাঁহার সেই পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর সন্দর্শন করিয়া,

সানন্দে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিতে পারি। আমি তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিবমাত্র। এ পতিত লক্ষ্মণ তাঁহার নিকটস্থ হইবে না; এ অধম, শোকার্ত্ত হইয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার প্রয়াসী হইবে না। আমার এ মহদুপকার তুমি করিবে কি ভাই?"

অনন্তর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"রে ভ্রান্ত লক্ষ্মণ! তুই যখন রাম-পরিত্যক্ত হইয়াছিস্, তখন বসুন্ধরার তাবতেই তোকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তুই রঘুনাথের প্রিয়ানুজ বলিয়াই তো, সংসারে তোর পরম সমাদর ছিল। সেই রঘুনাথ তোকে যে মুহূর্ত্তে বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই তোর সকল সমাদরের সমাপ্তি হইয়াছে। এক্ষণে কেহই আর তোর বাসনা পূরণ করিবে না। কিন্তু এখনও মৃত্যু হইতেছে না কেন? আর কতক্ষণ এরূপ অসহনীয়া জ্বালা ভোগ করিতে হইবে? রে বনের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ! হে বনস্পতি-সমূহ! তোমরা শুনিয়াছ কি, এ অভাগা লক্ষণ রাম-হারা হইয়াছে। এখন আমার কি কর্ত্তব্য, কেহ বলিতে পার কি? কোথায় যাইলে রামের দর্শন পাইব, তোমরা তাহা জান কি? আহা! সম্মুখে ঐ যে সুশ্যামল-মহীরুহ বিরাজ করিতেছেন, উনি পাদপ-কুলের চূড়া। ঐ পরম বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বৃক্ষ-সকাশে গমন করিলে, আমি নিশ্চয়ই সদুপদেশ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব।"

তখন লক্ষ্মণ দ্রুতবেগে সেই বৃক্ষের সমীপাগত হইয়া বলিলেন,—"হে সর্ব্বদর্শিন্ পাদপরাজ! বল আমাকে, আমি কোথায় গেলে হৃদয়-রঞ্জন রঘুনাথের দর্শন লাভ করিব। মুমূর্ষু অবস্থায় আমি তোমার এই সুশীতল আশ্রয়ে সমাগত হইয়াছি। তুমি আমাকে সদুপদেশ দানে চরিতার্থ কর।

—কিন্তু একি? একি অপরিজ্ঞাত আনন্দে আমার অন্তর সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠিল! একি অলৌকিক সুখে সহসা এ পতিত কলেবর পুলকিত হইয়া পড়িল! রে ভাগ্যবন্ লক্ষণ! সহসা কি অপার্থিব অমৃত রস তোর অন্তর প্রদেশে সিঞ্চিত হইল। চাহিয়া দেখ্—কাতর লক্ষ্মণ! নিজ হৃদয়-উদ্যানে দৃষ্টিপাত কর্। অহো একি সৌভাগ্য! হসন্মুখ, সর্ব্বসুখ-স্বরূপ রামচন্দ্র যে তোর হৃদয়েই বিরাজিত। ঐ দেখ্ মূঢ়! কেমন ধীরে ধীরে, সেই প্রেমময়ের পবিত্র কলেবর হইতে, কি অতুলনীয় প্রেম-সুধা স্যন্দিত হইয়া, তোর সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত করিতেছে। আহা! প্রভো! তোমার আজি একি অপরূপ শ্রী! হে কৃপাময়! তোমার এতাদৃশ অলৌকিক রূপ আর কখন এ অধীন নয়ন-গোচর করে নাই। হা চির-স্নেহ-পরায়ণ! আমার প্রতি তোমার চির-দিনই এইরূপ কৃপা। রে লক্ষ্মণ! এক্ষণে নয়ন ভরিয়া, এই রূপ-সুধা পান কর; প্রাণ ভরিয়া সঙ্গ-সুখ সম্ভোগ কর। মরি রে লক্ষ্মণ! এরূপ সর্ব্ব-গুণময়-জ্যেষ্ঠের প্রেম, তোর মত, আর কে কবে লাভ করিয়াছে? কিন্তু এ আবার কি? আবার যে আমার হৃদয় শূন্য—সিংহাসন অনধিকৃত। কৈ, প্রভু রামচন্দ্র কৈ! কোথায় প্রভু রঘুনাথ? অন্ধকার—বসুন্ধরা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন; লক্ষ্মণের হৃদয়-কানন ঘোর-তিমিরাচ্ছন্ন; লক্ষ্মণ-নয়ন দৃষ্টিহীন। কোথায় রামচন্দ্র! তুমি কোথায় পলায়ন করিলে? তোমার অদর্শনে, তোমার অনুগত সেবক, তোমার প্রাণের ভাই, মরণাপন্ন। দেখা দেও—হে প্রেম-প্রস্রবণ! আবার দেখা দেও। ঐ যে দূরে তোমার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি। তোমার চরণে ধরিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, নাথ! আর এরূপ কৌতুক করিয়া আমাকে মর্ম্ম-পীড়িত করিও না।”

লক্ষ্মণ আবার উন্মত্তবৎ ধাবিত হইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"চল প্রভু, তুমি কত-বেগে ধাবিত হইতে পার, দেখিব। আমি তোমাকে না ধরিয়া ক্ষান্ত হইব না। এবার তোমাকে ধরিতে পারিলে, আর কোন ক্রমেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আর কদাপি তোমাকে আমার হৃৎ-সিংহাসন হইতে স্থানান্তরিত হইতে দিব না। রে ভাগ্যবন্ লক্ষ্মণ! নয়ন ভরিয়া রঘুনাথের ঐ নয়ন-বিনোদন অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিতে থাক্! নয়ন রে! আর পল্লব ফেলিস্ না; চিত্ত রে! আর কোন দিকে আকৃষ্ট হইস্ না। আজি তোর সম্মুখে রামচন্দ্র। দেখ হে অযোধ্যাবাসিগণ! ঐ দেখ অলৌকিক রূপরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে, আমার দেবতা চলিয়া যাইতে-ছেন। এবার আমি তোমাকে একবার বাহুপাশে বদ্ধ করিতে পারিলে, আর কদাপি পরিত্যাগ করিব না।"

লক্ষ্মণ, উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া এবং কোন বিঘ্ন বাধায় লক্ষ্য না করিয়া, ধাবিত হইতে লাগিলেন। বন্ধুর পথে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, কখন বা তিনি ভূ-পতিত হইতে থাকিলেন; তখনই আবার গাত্রোত্থান করিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন। কণ্টকাদিতে তাঁহার দেহ ও পদ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, রুধি-রাক্ত হইতে লাগিল; তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। এই রূপে ধূলি-ধূসরিত ও রক্তাক্ত-কলেবর লক্ষ্মণ, ক্রমশঃ স্বচ্ছ-সলিলা সরযূতীরে, সমাগত হইলেন। তখন আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"কৈ রাম! কৈ রাম! আবার তোমার মধুর মোহন কান্তি দেখিতে পাইতেছি না কেন? কোথায় গেলে দয়াময়! প্রাণ যে যায়; তোমার অদর্শন তিলেকের নিমিত্তও সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। দেখা

দেও—রাজীব লোচন! দেখা দেও। অহো! সম্মুখে ওকি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ! ওকি অপার্থিব শোভা! ঐ যে করুণাময়! হে দেবতা! তোমার বামদেশে অতসীকুসুমসঙ্কাশা শোভাময়ী ও কোন্ সুন্দরী। উনি যে আমার মা জানকী। এতদিন পরে, অয়ি দয়াময়ি! এ তাপিত-প্রাণ লক্ষ্মণকে তোমার মনে পড়িয়াছে? তাই মা, আজি তুমি অলৌকিক-সুষমা-সমন্বিতা হইয়া, এ অধম লক্ষ্মণকে দেখা দিতে আসিয়াছ? ধন্য লক্ষ্মণ! তোর সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমাদের সেবক সন্নিকটে নাই বলিয়া তোমরা ক্রুদ্ধ হইতেছ? যাই আর্য্য, যাই। যাই মা, যাই। এই যে তোমাদের দাস উপস্থিত।”

এই বলিতে বলিতে, উন্মত্ত লক্ষ্মণ সানন্দে সরযূ-সলিলে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে সেই অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্ত, অপরি-সীম-বীর-বিক্রম-সম্পন্ন, অলৌকিক সাধু-চরিত্র লক্ষ্মণের জীব-লীলা পরিসমাপ্ত হইল! অযোধ্যাবাসী নরনারী, লক্ষ্মণের এবংবিধ পরিণাম দর্শন করিয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল এবং অত্যুচ্চ-রোদন-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে থাকিল।

উপসংহার।

এদিকে, অননুভূতপূর্ব্ব শোকে অবসন্নান্তর রামচন্দ্র, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু একান্ত ভ্রাতৃভক্ত ও রামের পাদুকা-পূজক ভরত কোন ক্রমেই সে ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তিনি রামের অনুগামী হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তখন রাজমন্ত্রী সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—"হে মহারাজ! শোকের বশবর্ত্তী হইয়া, এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সঙ্ঘটন করা নিতান্ত বিগর্হিত ব্যবস্থা। প্রভু বানপ্রস্থ পরিগ্রহে সমুদ্যত হইলে, আপনার অনুগত অনুজগণ, যে চিত্ত স্থির রাখিয়া, রাজ-কার্য্য পরিচালনায় সক্ষম হইবেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব মহারাজেরই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, এই গুরুভার বহন করা একান্ত আবশ্যক।"

তখন সেই মূর্ত্তিমান্ শোক-স্বরূপ রঘুনাথ, নিদারুণ বিষাদ-বিমিশ্রিত ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"হে মন্ত্রিন্! আজি লক্ষ্মণ নাই। যখন, ঋষিসত্তম বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে, তাড়কা-নিধনে নিযুক্ত হইয়া, দারুণ ভয়াকুল হইয়াছি, তখন পশ্চাতে, লক্ষ্মণের নির্ভীক চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া, সমুৎসাহিত হইয়াছি। যখন রাজর্ষি-জনকালয়ে, সেই মহাসভাস্থলে, হরধনুভঞ্জনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত

করিতেছি, তখন লক্ষ্মণের উৎসাহ পূর্ণ বদন দর্শন করিয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়াছি। আকস্মিক-বজ্রোপম পিতৃনিয়োগের বশবর্ত্তী হইয়া, রাজ-ভবন পরিত্যাগ-কালে, যতবার পশ্চাল্লক্ষ্য করিয়াছি, ততবারই তদীয় সুকোমল বদনকমল নয়নপথবর্ত্তী হইয়া, আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে। সেই ঘোরারণ্যে, ভঙ্গুর কুটীরাশ্রয়ে, সীতার সহ অবস্থানকালে, গভীর নিশীথে, সহসা কারণ-বিশেষে যখনই ভীত হইয়াছি, তখনই জাগ্রত লক্ষ্মণের হুঙ্কার-ধ্বনি আমার অন্তরে সাহসের সঞ্চার করিয়াছে; যখন সীতাহারা হইয়া, বনে বনে আকুলভাবে রোদন করিয়াছি, তখন অবিরত পার্শ্বে লক্ষ্মণের প্রেমপূর্ণ সমশোকসন্তপ্ত বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, আশ্বস্ত হইয়াছি। যখন ঘোর রণস্থলে সংশয়িত-প্রাণ হইয়াছি, তখন পশ্চাতে প্রেমময় অশ্রুসমাকুল লক্ষ্মণের বদন-মণ্ডল দর্শন করিয়া, অপরিসীম সাহস লাভ করিয়াছি। এইরূপ অতীত জীবনের বৃত্তান্ত যতই আলোচনা করিতেছি, ততই বুঝিতেছি, লক্ষ্মণহীন রাম নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব। আমার সেই লক্ষ্মণ আজি আর নাই। অথচ তোমরা রামকে রাজ-কার্য্য পরিচালনায় বিনিযুক্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিতেছ। ধিক্ ধিক্ সে রামকে, যে লক্ষ্মণশূন্য হইয়া এখনও সংসারে অপেক্ষা করিতেছে!"

অপর দিকে, মথুরা রাজ্যে শত্রুঘ্নের সমীপে দূত উপস্থিত হইয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি, কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে কহিলেন—"রে দূত! এই মর্ম্মবিদারক ঘটনার পর, আর্য্য রামচন্দ্র কদাপি সংসারে থাকিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব আর্য্যের ছায়াতুল্য অনুজগণও, অবশ্যই তাঁহার অনুগামী না হইয়া, থাকিতে

পারিবে না। বোধ হইতেছে যেন, এতদিন পরে, কালপুরুষ সেই অপরিচিত ঋষিরূপ ধারণ করিয়া, এইরূপে আমাদের জীবলীলা-বসান করিবার নিমিত্তই সমাগত হইয়াছিলেন; সুতরাং অধুনা আক্ষেপের আর কোনই প্রয়োজন নাই।"

তদনন্তর তিনি, পুত্রদ্বয়ের রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বলিলেন,—"হে বৎস! আমাকে তোমরা চির-বিদায় প্রদান কর। আজি অযোধ্যায় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। সত্যানু-রোধে পুণ্য-স্বরূপ রামচন্দ্র, আর্য্য লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছেন। এ নিদারুণ ঘটনার পর, রঘুনাথ যে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। হে বৎসগণ! আমরা ভুবনজ্যোতিঃ রামচন্দ্রের ছায়ামাত্র। তিনি চৈতন্য, আমরা জড়-দেহমাত্র। অতএব তাঁহার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি। এক্ষণে তোমরা স্ব-স্ব-কর্ত্তব্য স্থির রাখিয়া, প্রজাপালন করিতে থাক। আমি বিদায় হই। আর বিলম্ব করিতে আমার সামর্থ্য নাই। হয়ত এতক্ষণে কত অনর্থোৎপত্তিই হইয়া থাকিবে।"

তিনি উত্তরাপেক্ষা না করিয়া, দ্রুতগামী রথারোহণে অন-তিকাল মধ্যে, অযোধ্যায় উপনীত হইলেন এবং, নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে, রাম-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অযো-ধ্যার সিংহাসনাধিকার করিয়া প্রজাপালনের জন্য, রামচন্দ্র তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শত্রুঘ্ন, নিতান্ত কাতরভাবে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া, রোদন করিতে করিতে, তদীয় অনুগামী হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন এবং অন্য কোন প্রকার কার্য্যে পরিলিপ্ত হইতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

অগত্যা, বশিষ্ঠ দেবের মন্ত্রণানুসারে, কোশল রাজ্যে কুশ এবং উত্তর কোশল রাজ্যে লবকে রাজ-পদাভিষিক্ত করা হইল।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই, রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ও লোক-লীলা সংবরণ করিলেন।

সমাপ্ত।